সমকালীন জীবনবোধ

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

সমকালীন জীবনবোধ

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সমকালীন জীবনবোধ
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৮২

ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৮৯১.৪৪০৪
ISBN : 984-06-0566-6

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৮১

দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ

জুন ২০০০

আষাঢ় ১৪০৭

রবিউল আউয়াল ১৪২১

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৪.০০

SAMAKALIN JIBANBODH (The Feeling of Contemporary Life): written by Maulana Abdur Rashid Tarkabagish in Bengali and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2000

Price : Tk 14·00, US. $ 0·50

জীবনে যার ঋণ অপরিশোধ্য সেই
মহান আব্বাজান দেশবিখ্যাত
পীর মুর্শেদ হযরত সৈয়দ শাহ্
আবূ ইসহাক কেবলার
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

—আবদুর রশীদ

প্রকাশকের কথা

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সু-সাহিত্যিক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি ঐতিহাসিক সালঙগা বিদ্রোহে নেতৃত্বদানসহ অন্যান্য আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আজীবন বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সুদীর্ঘ সম্পৃক্তি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনাকে যেমন শাণিত করেছে, তেমনি তাঁকে একজন বিশ্লেষণধর্মী লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। চিন্তা-চেতনা ও মননে উদার ও সংস্কারমুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর বিশ্লেষণগুলোও সংকীর্ণতামুক্ত। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার একটি অনন্য স্বাক্ষর তাঁর 'সমকালীন জীবনবোধ' বইটি। এতে 'রাজনৈতিক আবর্তে শিক্ষা', 'বিশ্বশান্তি', 'ধর্ম এবং কর্ম' ও 'যার শেষ নেই' শীর্ষক চারটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইটি ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমকালীন প্রেক্ষাপটে গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলোর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী বিবেচিত হওয়ায় বইটি নতুনভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য, বাস্তবতার কারণে 'জীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আমরা আশা করি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ রচিত 'সমকালীন জীবনবোধ' বইটি ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত হবে এবং এতে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আমরা মরহুম লেখকের রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

সূচি

রাজনৈতিক আবর্তে শিক্ষা

বুদ্ধি মানবের সহজাত। জ্ঞান বা শিক্ষা আহরণ করতে হয়। এই দুটি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মানব মন শিক্ষার দ্বারা কর্ষিত না হলে জ্ঞানের উন্নত, ফলপ্রসূ ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। এজন্য মানবজাতির উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ শিক্ষা। শিক্ষায় যারা উন্নত বা অগ্রসর হয়েছেন, তারাই নিজেদের বিভিন্ন সম্পদে অলংকৃত করতে পেরেছেন ; সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এবং বাদবাকি বিশ্ব তাদের অনুসরণ করেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। সেহেতু, যথার্থ অর্থেই শিক্ষা মানবজাতির উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

'লায়লাতুল কদর' বা 'সম্মানিত রজনী' 'এক সহস্র মাস হতেও উত্তম'—বলে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, এই রজনীতেই আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। আল-কুরআনে প্রথম যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তা 'ইকরা'। অর্থাৎ 'পড়ো'। এটাই আল-কুরআনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা) বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"জ্ঞান শত্রু মহলে ঢাল এবং মিত্র মহলে অলংকার।"

ইসলামে জ্ঞানার্জন এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। জ্ঞানার্জনের নির্দেশসহ আল-কুরআন যে রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই রজনীকে সহস্র মাস হতেও উত্তম আখ্যা দেয়া হয় এ কারণেই। এই গুরুত্বকে অনুধাবন করে তৎকালীন মুসলমানগণ জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এবং ব্যাপক জ্ঞানচর্চার দ্বারা তারা সমাজ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে পেরেছিলেন, স্রষ্টাকে জানতে পেরেছিলেন, এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তাও সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সর্বশ্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রেম, ভালবাসার অভিব্যক্তিই এই সৃষ্টি। অতএব, স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হলে সৃষ্টির মাধ্যমেই সে ভালবাসা কার্যকর করা সম্ভব।

"যিনি মর্তের বাসিন্দাকে ভালবাসেন, সর্বোপরি যিনি আছেন, তিনি তাঁকেই ভালবাসেন।" (আল হাদীস)

কাজেই, এই নীতিমালা অনুসরণ করলে আমরা বিশ্ব জগতের অধিবাসীগণ একে অপরকে ভালবাসতে পারি, একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি ; আমাদের জ্ঞানসঞ্চিত সকল সুবুদ্ধি, চিন্তা সেই পথে প্রয়োগ করতে পারি। এই বোধ হতে জন্মলাভ করে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট সকল মানবমণ্ডলীর সমতার চেতনা। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"সমস্ত মানবজাতি একই গোত্রভুক্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৩)

এক আদম হতে সকলের উদ্ভব এবং আদম মৃত্তিকা হতে। এতে মানুষের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য, জন্মগত কৌলিন্য, ভৌগোলিক সীমারেখাজনিত তারতম্য সবই নস্যাৎ হয়ে যায়।

আল-কুরআনে আছে ঃ

"বিশ্বাসী (মুমিন) মাত্রেই ভাই ভাই।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষই একে অপরের ভাই। আমরা জ্ঞান-সাধনা, চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতিদত্ত যে অমূল্য সম্পদরাজি লাভ করবো, সেই সম্পদের উপযোগিতা নিজে যেমন ভোগ করবো, আমার ভাইকেও তেমনিভাবেই তা ভোগ করবার সুযোগ দেব। এই কর্তব্য যারা সঠিকভাবে প্রতিপালন করছেন না, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক ধর্মকেই অবহেলা করছেন। আর যারা এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি সকল কর্তব্য পালন তো করছেনই না, বরং পরস্পর দুশমনী করছেন, তারা প্রাকৃতিক ধর্মের তো বিপরীত আচরণ করছেনই, উপরন্তু নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ডেকে আনছেন।

আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টা গবেষণাকে কোন কোন সাহাবা সত্তর বা আশি বছর ইবাদতের সমতুল্য বলেছেন। এই গবেষণালব্ধ ফল ব্যবহৃত হবে সৃষ্টির দুঃখ, অশান্তি বা ধ্বংসের জন্যে নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির হিতের জন্য, সুখের জন্য, শান্তির জন্য। ইসলামের জ্ঞানান্বেষণ ও গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির মধ্যে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামের স্বর্ণযুগে সমাজ জীবনে এই উদ্দেশ্যে প্রতিফলন ঘটেছিল। কেননা, জ্ঞানচর্চায় সে যুগের মুসলমানগণ যেমন নিয়োজিত ছিলেন অনলস সাধনায়, তেমনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এই সাধনার সুফলকে পৌছে দেয়ার ব্যাপারেও তাঁরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

তৎকালে মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে অবদান রেখেছেন, তা একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই

ব্যবহৃত হয়েছে। সুখী, সমৃদ্ধশালী মানব সমাজ গঠনের জন্য নিয়োজিত ছিল তাঁদের সমগ্র কর্মোদ্যোগ। যা আজ পাশ্চাত্য জগতের ঐতিহাসিক, গবেষকগণও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক মুসলিম মনীষীর নাম হয়তো অধিক আপন করার ইচ্ছায় তাঁদের নিজ নাম বা ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। আমি এটাকে তাদের দোষ নয় বরং গুণ বলেই মনে করি। কেননা, যখন কোন জাতির মধ্যে জ্ঞানের 'হজমী শক্তি' বৃদ্ধি লাভ করে, তখন তারা বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণী এবং তাঁদের অবদানকে আপন করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মুসলমানগণও যখন জ্ঞানচর্চার উচ্চতর সোপানে অবস্থান করছিলেন, তখন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের সকল অবদান আহরণ করে তা হজম করার ব্যাপারেও ছিলেন তারা অকুণ্ঠচিত্ত। তাই তো দেখি, গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলকে আঁরাস্তু, প্লেটোকে আফলাতুন, দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে বাদশাহ সেকেন্দার নামে আখ্যা দিতে তাদের ঈমান বিপন্ন হয়নি!

কিন্তু আজ আমাদের জ্ঞান শক্তির বদ-হজম হওয়ায় নিজেদেরই মধ্যেকার চিন্তাবিদ, ভাবুক, গবেষক, কবি-সাহিত্যিকের অভিমতের সঙ্গে কোন 'বুযুর্গানে দীনে'র মত-বৈষম্য হলেই তাকে 'কাফির' বলে 'ইসলাম-সীমার' বাইরে বিতাড়িত করা হয়। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> "তোমরা তোমাদের প্রভুর (রব) পথের দিকে আহবান করো যুক্তিপূর্ণ বাক্য এবং বিনয়-সুন্দর আচরণের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

ইসলামের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের পথে বিনম্র ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে কোথায় আজ অশান্ত বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান করবো, অথচ তা না করে নিজেদের ক্ষুদ্র মতভেদের জন্য একে অপরকে 'কাফির' বলে ফতোয়া জারি করছি। কি পরিতাপের বিষয়! এদের সকলের ফতোয়া যদি বিশ্বাস করা যায়, তা হলে হয়তো বিশ্বে একজন মুসলমানও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ বিশ্বের এই সংকটকালে ইসলামের বাণী অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও কল্যাণের বাণী প্রচারের চরম মুহূর্ত এসে গিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদ এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার বিশ্ববাসীকে হয়তো আনন্দবিলাসের কিছুটা খোরাক যোগাচ্ছে; কিন্তু মূলত তারা বিশ্ব হতে সুখ-শান্তি অপহরণ করছে এবং শান্তির নাম করে বিশ্বকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিপর্যস্ত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা—মুসলমানরা কি করছি? 'ইকরা'—'পড়ো' এই বাণীর দ্বারা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষাকে বিশ্বময় প্রবর্তনের নির্দেশই প্রদান করেন। তাই প্রাথমিক যুগের

মুসলিম মনীষীগণ বার বার আত্মিক শপথ গ্রহণ করে আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণকেই একমাত্র সাধনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তখন পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার্থীগণও ছুটে আসতেন আমাদের দারুল উলুম বিদ্যালয়ের পানে। আমাদের নিকট থেকে মধু ও সুবাস গ্রহণ করে তাঁরা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কত উন্নতি সাধন করেছেন! যাদের কাছে থেকে জ্ঞানের বর্তিকা নিয়ে তারা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, হায়! ভাগ্যের কি পরিহাস, আজ তারাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা যেদিন হতে 'ইকরা' তথা কুরআনের জ্ঞান অনুশীলনের শপথ গ্রহণের পরিবর্তে কেবলমাত্র ইবাদত-বন্দেগী ও মোনাজাতের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেছি, সেদিন থেকেই আলো বিকিরণকারী জাতি ঘোর অমানিশায় ডুবে যেতে থাকে।

এখন ব্যথিত হৃদয়ে বলতে হয়, লায়লাতুল কদর-এর খুঁটিনাটি বিরোধ অবলম্বন করে আল্লামাগণ কত গ্রন্থের পাহাড়ই না গড়ে তুলেছেন। মৌলভীগণ তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে কতই না উল্লসিত। কিন্তু, ছিলাম কোথায়, যাবো কোথায়, পৌঁছেছি কোথায়--হায়, দুটি চোখ থাকতেও দেখছি না।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার শতকরা নিরক্ষরতার হার দেখলেই বোঝা যায়, কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে আমরা কত নিচে নেমে গেছি।[১] এই অজ্ঞানতাই যে বিশ্ব মুসলিম সমাজকে বার বার পেছনে টানছে-- এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ আছে বলে মনে করি না। মূলত এ কারণেই আজকের মুসলিম বিশ্ব সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে যেতে পারছে না, পারছে না শিল্পোন্নত শক্তিমান দেশসমূহের প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে। শুধু তাই নয়, অহেতুক বৃদ্ধি পাচ্ছে পারস্পরিক অনৈক্য আর বিবাদ-বিসংবাদ। আর এসবের সুযোগে সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিল ও স্থায়ী সংকট। ফলে মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রতি মুহূর্তে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই আমি মনে করি, মুসলিম জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী-গুণী, চিন্তাবিদদের এ ব্যাপারে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে পথ প্রদর্শনের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

---

১. শতকরা নিরক্ষরতার হার ঃ মরক্কো-৮৬ ; তিউনিসিয়া-৭০ ; আলজিরিয়া-৮০ ; নাইজেরিয়া-৭৫ ; গ্যাবন-৮০ ; লিবিয়া-৭৩ ; তুরস্ক-৪৯ ; সৌদী আরব ; (যেখানে নূর-এ জবলের হেরা গুহায় কুরআনের মহাবাণী 'ইকরা' অবতীর্ণ হয়েছিল)-৮৫ ; ইরান-৭৭ ; ইরাক-৭৬ ; কুয়েত-৪৫ ; লেবানন-১৪ ; আরব আমিরাত-৮০ ; কাতার-৮৫ ; মালয়েশিয়া-৫৭ ; ইন্দোনেশিয়া-৫৭ ; জর্দান ও সিরিয়া-৬৯ ; মৌরিতানিয়া-৯৫ ; সেনেগাল-৯০ ; গিনি-৯০ ; জাম্বিয়া-৯০ ; ক্যামেরুন-৯৫ ; মিসর-৭৪ ; সুদান-৮৫ ; উগাণ্ডা-৮০ ; মালাবী-৭৮ ; পাকিস্তান-৮৪ ; মালী-৯৫ ; নাইজার-৯৫ ; চাদ-৯০ ; সোমালিয়া-৯৫ ; ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন-৯০ ; আফগানিস্তান-৯২ ; বাংলাদেশ-৭৫!

দুই

বাস্তববর্জিত ধর্মশিক্ষা কোন জাতি গঠনে সমর্থ নয় ! এবং ধর্ম বর্জিত বাস্তব শিক্ষাও কোন জাতিকে নিষ্কলুষ চরিত্র দান করতে পারে না। ইসলামের স্বর্ণযুগে বাস্তব বর্জিত ধর্ম শিক্ষার প্রচলন ছিল না। কুরআনের মৌলিক নীতি অনুসরণ করেই ইসলামের সকল শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মানবিক চেতনাকে উত্তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এবং এর প্রেক্ষিতে বাস্তব বা পার্থিব সকল বৈষয়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। মানব সমাজের জন্য মানবিক শিক্ষার ভিত্তির উপর পার্থিব সকল বৈষয়িক শিক্ষা অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সমরনীতিক প্রভৃতি সকল শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যে রাজনৈতিক শিক্ষা অপরের স্বাধীনতা, অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করে, সে শিক্ষা ইসলাম পরিপন্থী। যে অর্থনীতি নিজের, নিজ জাতির এবং সমগ্র মানব জাতির যথানিয়মে উপকারে আসে, সেই অর্থনীতিই ইসলাম সমর্থিত। যে অর্থনৈতিক শিক্ষা ব্যাক্তিকে পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ফাঁপিয়ে তোলে এবং সমষ্টিকে আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটনের আবর্তে নিক্ষেপ করে, সে শিক্ষা মানবতা তথা ইসলাম বিরোধী। বাণিজ্যিক শিক্ষাও যদি মানবতার নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তার লক্ষ্য হবে মানুষের হিত কিভাবে হতে পারে, সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা।

যে বাণিজ্যের দ্বারা নিজেকে বা আপন দেশকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী করা এবং অপর দেশকে নানা কূট-কৌশলে সম্পদহীনতা ও দুঃখের দিকে ঠেলে দেয়া হয়, সেই বাণিজ্যনীতি ইসলাম তথা মানবিক মৌলিক নীতি বিরোধী। ইসলামের মৌলিক নীতি মানবিকতা তথা ন্যায় ও সত্যকে সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করা। এই সত্য রক্ষার জন্য শক্তির প্রয়োজন আছে, তবে সেই শক্তি ন্যায় ও সত্যকে রক্ষার জন্য মাত্র ব্যবহৃত হবে। এই সীমা বিন্দুমাত্র অতিক্রম করলেও তা হবে ইসলাম তথা মানবিক সমরনীতির পরিপন্থী। সেহেতু আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্‌র পথে তথা ন্যায় ও সত্যের পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করো।" (সূরা সাফ্ফ ঃ ১১)

অর্থাৎ যারা ন্যায় ও সত্যকে বাধা দিতে বা বিলুপ্ত করতে আসে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জিহাদ করো।

"কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

এটাই ইসলামের সমরনীতির মৌলিক ভিত্তি। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে,

তৎকালে এটাই ছিল সমরনীতির মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের সমরনীতি যদি পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী সঠিকভাবে অনুসরণ করা হতো, তাহলে আজকে বিশ্বময় দুর্বলকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করার এই মানবতা বিরোধী যুদ্ধরীতি প্রসার লাভ করতে পারতো না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই সব মৌলিক নীতি শিক্ষার মাধ্যমে সুসংগতভাবে অবলম্বনের ফলেই সর্বমুখী, বিস্ময়কর উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। মানবিক শিক্ষাকে প্রায় পরিহার করেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে ধর্মের নাম করে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, এবং সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিকতা চর্চায় মনোনিবেশ করা হয়। ফলে পার্থিব বাস্তব শিক্ষার দিক শিথিল হয়ে যায়। যার জন্য উভয় পথে সীমা অতিক্রম ও তার পরিণতি মুসলিম বিশ্বে বিপর্যয় আনয়ন করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে নিজের কল্যাণের জন্য যে প্রার্থনা শিক্ষা দেন তা হলো ঃ

"হে আমাদের প্রভু, আমাদিগকে পার্থিব জগতের সকল কল্যাণ দান করো এবং পারলৌকিক জগতেরও সকল কল্যাণ দান করো।" (সূরা বাকারা ঃ ২০১)

অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জগতের সকল কল্যাণ কর্মের মাধ্যমেই পারলৌকিক জগতের সকল কল্যাণ লাভ করবে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর বিভক্তির ফলে ইসলাম জগতের উত্থান-পতন দেদীপ্যমান। ইসলামের ইতিহাসে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ইসলামের সেই বিরাট ইতিহাস বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে কোন একটি মুসলিম দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই সামগ্রিক চিত্রের একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

তিন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্-দৌলাকে পরাজিত করার পর এই দেশে যে শাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই জাতির মানসিক শক্তি ভেঙ্গে দিয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে রাখা। মুসলিম মনীষীগণ যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বৃটিশদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্রোহ, খণ্ডযুদ্ধ শুরু করেন, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝতে পারেন যে, ধর্ম শিক্ষার নাম করে আল কুরআনের শিক্ষা হতে যদি এদেরকে সরিয়ে না রাখা হয়, যদি এদের চিন্তা ও উদ্দেশ্যের গতিপথ পরিবর্তিত না করা হয়, তাহলে এদের মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালী

উল্লাহ, হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, ইসমাইল শহীদ, তিতুমীর ও ফরায়েজী আন্দোলনকারীরা জন্মগ্রহণ করতেই থাকবে। এজন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কলিঙ্গা নামক স্থানে আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান গোলতালাবেরই আদি নাম ছিল কলিঙ্গা। এই মাদ্রাসার শিক্ষাসূচীতে অর্থকরী ও বৈষয়িক শিক্ষার স্থান ছিল না। ফলে এই মাদ্রাসার উচ্চতম ডিগ্রীলাভের পরে যারা মৌলভী-মওলানা হয়ে বের হতে লাগলেন, সাধারণত তাদের জীবন যাপনের নিম্নতম প্রয়োজনের জন্য পরনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোন পথ রইলো না।

সদ্য রাজ্যহারা মুসলমান বৈদেশিক বেনিয়া গোষ্ঠীর ও স্বদেশী প্রতিবেশীদের চক্রান্তে সর্বহারা এক কাঙাল জাতিতে পরিণত হলো। চরম দরিদ্রতা আর অবজ্ঞার যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকলো এদেশের মুসলিম জনগণ। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

"দরিদ্রতা কুফরীর নিকটবর্তী।" (আল-হাদীস)

দেশের হাদীগণ জাতিকে এই পতনের গহ্বর হতে উদ্ধারের পরিবর্তে তারাই জনসাধারণের কাঁধের বোঝা হয়ে পড়লেন। জমিদারী, মহাজনী, জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সবই অমুসলমানদের হাতে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের অমুসলমান ভাইয়েরা দ্রুতগতিতে আধুনিক শিক্ষা আয়ত্ত করে ফেললেন। এবং রাজকার্যে বৃটিশদেরকে সহায়তা করা থেকে শুরু করে জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চললো তাদেরই জয়যাত্রা।

অন্যদিকে, ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে পড়তে বাদশাহ্‌র জাত হলো নিপীড়িত প্রজা, শোষিত খাতক, বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক, দিন-মজুর। সামাজিক অবস্থার এই বিপর্যয়ের উৎস হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ অবক্ষয়ের জন্য যারা মাদ্রাসা ও আলিমগণকে সামগ্রিকভাবে দায়ী করেন, তারা কখনো প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির দোষক্রটিগুলো খুঁটিয়ে দেখেননি। এই আত্মঘাতী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনেরও চেষ্টা করেননি।

যা হোক, দেশে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলো কতিপয় মুসলিম মনীষীর প্রচেষ্টায়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলমান জাতিকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা; জীবনের প্রতিমুহূর্তের প্রয়োজনের সংগ্রামের উপযোগী করে তোলা। ফলে বিলম্বে হলেও মুসলমানরাও মন্থরগতিতে আধুনিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্যয়বহুল হেতু এ শিক্ষা সাধারণ মুসলিম পরিবারের ছেলেদের জন্য অনুকূল ছিল না।

অপরদিকে কিছু অন্ধবিশ্বাসী গোঁড়া লোক প্রচার করছে ঃ মুসলমান দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ভোগের জন্য আসেনি। তারা আখেরাতে অনন্ত সুখ ভোগ করবে। মুসলমানরা যখন বিশ্বে সর্বাপেক্ষা সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠলো, তখন তাদের মধ্যে আরাম-আয়েশের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভোগ-লালসার শিকারে পরিণত হয়ে পড়ে।

তৎকালীন চিন্তাশীল সমাজ হিতৈষীগণ বাস্তব অবস্থা দর্শনে শংকিত হয়ে সমাজে প্রচার করতে লাগলেন যে, এ পার্থিব জগতের সুখ ঐশ্বর্যটাই বড় নয়। বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে তা নেহাতই মূল্যহীন। কেননা, ভোগ-লালসায় মত্ত থাকাটা মুসলমানদের ধর্ম নয়; মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যই তাদের সমগ্র জীবন সাধনাকে নিয়োজিত রাখা উচিত। এইভাবেই তাঁরা সম্পদ-প্রাচুর্যের মোহ থেকে জাতিকে কল্যাণের পথে উজ্জীবিত করার জন্য প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকলেন। আরা পরবর্তীকালে যখন মুসলমানরা চারিদিকে পরাজিত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ছিল, তখন মনীষীগণের প্রচারিত এইসব বাস্তব বৈরাগ্যমূলক প্রচারণাকে তারা সান্ত্বনা হিসেবেই গ্রহণ করে।

অনেকেই এসব কথা বিশ্বাস করে এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার পরোক্ষ কারণে দুনিয়াবী শিক্ষার পরিবর্তে দীনী শিক্ষার পথই অবলম্বন করেছিল। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনে সরকারী আর্থিক সাহায্য বলতে গেলে কিছুই ছিল না। কাজেই মাদ্রাসাগুলোকে দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হতো ! তাই, প্রায় প্রত্যেকটি মাদ্রাসার গায়ে দারিদ্রের ছাপ প্রকট ছিল। সাধারণত প্রায় প্রতিটি মাদ্রাসায় ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ানো হতো। মাদ্রাসা শিক্ষকগণের বেতন বহুক্ষেত্রে এত অল্প যে, তা উল্লেখের যোগ্যই নয়। দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে আলিম, ফাজিল, কামিল পাস করেও এহেন মাদ্রাসার চাকুরি অল্প সংখ্যকের ভাগ্যেই জুটতো। কাজেই, অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য ধর্মের নামে উপার্জনের বিকল্প পথ বেছে নিতে হয়। আলিমদের সমালোচনা করার লোকের অভাব কোন কালেই হয়নি, কিন্তু তাদের বাস্তব সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে ক'জন মাথা ঘামিয়েছে ? সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, আলিম সমাজও এ ব্যাপারে সচেতন নয়। তারা তাদের এই অসহনীয় দুর্দশার কথা অনুভবই করেন না, প্রতিকারের কথা তো দূরে থাক।

অপরদিকে ধর্ম বর্জিত বৈষয়িক শিক্ষাও জাতীয় জীবনে দুর্ভাগ্যজনক বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যে শিক্ষা মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করতে পারে না, মানুষকে সর্ব মানবের কল্যাণমুখী কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না—তাকেই আমি ধর্মবর্জিত বৈষয়িক শিক্ষা বলছি।

এই অনাহারক্লিষ্ট জাতির আর্থিক ত্যাগের দ্বারা জাতির প্রত্যক্ষ সেবার জন্য যে ডাক্তার বা চিকিৎসক শ্রেণী তৈরি করা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশের কার্যকলাপ দেখে সততই মনে হয়, মানবোচিত একখণ্ড হৃদয় কি এদের ভেতর নেই? অর্থ-লোভে এরা কশাইয়েরও নিম্নস্তরে নেমে গেছে। আর্তের কাতরানী ও কাতর মিনতিও এদের 'ভিজিট' নামক খাঁড়াকে এতটুকু অবনমিত করতে পারে না। এই দরিদ্র ও অনুন্নত দেশকে গড়ার কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। অথচ এদের কারো কারো ব্যক্তিস্বার্থের হুতাশন এতই তীব্র যে, জাতীয় স্বার্থ এ হুতাশনের মুখে জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যায়। তবুও এদের বিবেক জাগে না। দেখা যায়, তাদের নির্মিত পুলে গাড়ি উঠার পরই তা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের নির্মিত দালান, স্কুল-কলেজের পলেস্তারা, জানালা-দরজা অল্পদিনের মধ্যেই খসে পড়ে। তাদের পরিকল্পনা মত কোন কাজ আরম্ভ হলে মাঝপথেই থেমে যায়, অপচয় হয় সম্পদের। এর প্রতিকার কি করে হবে? অবশ্য সবাই যে লালসায় নিমজ্জিত—তা নয়, এর ব্যতিক্রমও আছে।

এই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যদি ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গতি বিধান করা হয়, তাহলেই একমাত্র এর প্রতিকার হতে পারে। মানবতা, পরহিত, সমবেদনা, প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি যে ধর্মের মৌলিক নীতি, আমি তার কথাই বলছি। সেই ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষের মধ্যে অপরিহার্য মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়ে মানবিকতার শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সমর্থ।

পার্থিব জগতের ধন-সম্পদ, সৌধরাজি—কেবল মাত্র এসবই যে অনিত্য তা নয়, এ সব লাভের লোভে যারা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের কথা একবারও চিন্তা করে না, তারা আরো অধিক অনিত্য। তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাদের মত বহুলোভীরা সকল সম্পদ-ঐশ্বর্য ফেলে রেখে এক অজানা জগতে প্রস্থান করছে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল ঃ

একবার বাদশাহ সেকেন্দার সমুদ্র পথে গমনকালে একটি জনহীন দ্বীপ দেখতে পান। তাঁর সাতখানা জাহাজ সেই দ্বীপে ভিড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, দ্বীপটি হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, স্বর্ণ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বাদশাহ সেকেন্দার তাঁর লোকজনকে এই মহামূল্যবান সম্পদরাজি জাহাজে তুলতে নির্দেশ দিলেন। জাহাজ পূর্ণ হয়ে গেল, আর তিল ধারণের জায়গাও রইল না। তিনি তখন তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ

হে প্রভু ঃ আমাকে একটি এমন ভাণ্ড দাও যার ভেতর এই দ্বীপের সমস্ত মালমাত্তা ধরতে পারে।

এক ফেরেশতা ছদ্মবেশে এসে বাদশাহ্কে একটি ভাণ্ড দিলেন এবং বললেন ঃ তোমার প্রভুর নামে এর ভিতরই সমস্ত মণি-মাণিক্য ধরবে।

দ্বীপের সমস্ত মণি-মাণিক্য ভর্তি করার পর দেখা গেল ভাণ্ডটি মাত্র গলা পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে, সম্পূর্ণ হলো না।

তখন বাদশাহ্ আবার প্রার্থনা করলেন ঃ

হে প্রভু, আরো কিছু মণি-মাণিক্য দাও, যাতে এই ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ করিতে পারি।

পুনরায় ছদ্মবেশে সেই ফেরেশতার আবির্ভাব হলো। ফেরেশতা বাদশাহ্কে বললেন ঃ

হে বাদশাহ্, তুমি এই ভাণ্ডটির মুখে এক মুঠি মৃত্তিকা দাও।

মৃত্তিকা দেয়া মাত্র ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে বাদশাহ্ সেকেন্দার ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মহাপুরুষ, আমি তো এর কোন মর্মার্থ বুঝতে পারলাম না।

ফেরেশতা জবাব দিলেন ঃ হে সেকেন্দার বাদশাহ্, এর মর্মার্থ হলো—তোমার মুখে মাটি না পড়া পর্যন্ত লোভ-লালসার পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

এই বলে ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এটি একটি গল্প মাত্র। তবে, এ গল্পে আমরা একটি বিরাট শিক্ষা লাভ করতে পারি। আরেকটি কাহিনীতে জানা যায়, সেকেন্দার বাদশাহ মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন ঃ

আমাকে কবরস্থানে নেবার সময় আমার হাত দু'টি কফিনের বাইরে রাখবে।

এর দ্বারা হয়তো তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমি দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেকেন্দার। বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বাদশাহ্ সেকেন্দার আজ সম্পূর্ণ খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলাম।

এই ঘটনার ঐতিহাসিক কোন মূল্য থাক বা না থাক, কিন্তু আমাদের সবাইকে খালি হাতেই বিদায় নিতে হবে, যেমন করে অতীতে সবাই নিয়েছে। ভবিষ্যতেও সবাইকে এভাবেই বিদায় নিতে হবে।

তাহলে আমার সাথে কি কিছুই যাবে না ? এই হতাশা চরম মুহূর্তে কতই না কষ্টদায়ক হবে ! তজ্জন্য আল্-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"তাহারা পারলৌকিক জগতে দৃঢ় বিশ্বাস করে।" (সূরা বাকারা ঃ ৪)

আল্-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"তুমি সকল মানুষের উপরে দায়াশীল হও। যে তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে, তাকে ক্ষমা করো। মানুষকে ছোট-বড় মনে করো না। অত্যাচারীকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না। পরের দুঃখ নিবারণ করবে। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সৎকর্ম করবে। এই সৎ-কর্মরাজি তোমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। এই সৎ কর্মসমূহের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা পারলৌকিক জগতে তোমাদেরকে তাঁর কল্যাণময়, চিরশান্তিময় স্থানের অধিকারী করবেন।"

মোটামুটি ইসলাম ধর্মের এগুলোই মৌলিক নীতি।

পারলৌকিক জগতে যারা প্রস্থান করেছেন তারা আর পুনরাগমন করে সেই অজ্ঞেয় জগত সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু জানাতে পারেন না। আধ্যাত্মিক চর্চা উৎকর্ষ লাভের ফলে মনীষীগণ বহু সাধনায় এর একটি সুষ্ঠু ধারণায় পৌঁছেছেন। এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নামই হলো 'একীন'। সৎকর্ম মাত্রই আমাদের পারলৌকিক জগতের চির কল্যাণের অধিকারী করবে ; এই বিশ্বাস পার্থিব জগতে আমাদের কি সৎকর্মে পরমোৎসাহিত করে না ? অপরদিকে, অবিশ্বাসীগণ যেমন সৎকর্মে উৎসাহ পেতে পারেন না, তেমনি মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই—নিরাশা ও হতাশায় নিজকে অসহায় মনে করেন। কাজেই 'একীন' বা বিশ্বাসের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আগেই বলেছি, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে এই হতাশা ও অসহায়তা থেকে যেমন মুক্তি দিতে পারে, তেমনি পার্থিব জগতে মানব কল্যাণমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ করতেও সক্ষম। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনানুসারে বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে। আজকে আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে অবক্ষয়ের কথা জ্ঞানী-গুণী, চিন্তাবিদগণ বলে থাকেন তার উৎস সন্ধান করতে হলে দৃষ্টি ফেরাতে হবে পেছনের দিকে!

এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই অবক্ষয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। মূলত এ হলো ইতিহাসের পাতা থেকে একটি জাতির নাম-নিশানা মুছে দেবার জঘন্য ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের বিচিত্র গতিধারায় বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা সেই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি। তাই আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের উৎস সন্ধান করে জাতিকে সুসংগঠিত করতে হবে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, এই জাতীয় অবক্ষয়ের মূল যে শিক্ষা ব্যবস্থায়, সে সম্পর্কে কখনো কখনো ঢালাও মন্তব্যের আকারে দুয়েক কথা বলা হলেও যথার্থ সত্যের উন্মোচন ঘটিয়ে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয়নি। আজও শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারার সংঘাত সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত করে তুলছে।

বৃটিশ মুসলমানের হাজার বছরের তখ্‌ত্‌ তাজ হরণ করেও নিশ্চিত হতে পারলো না! উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির পুনর্জাগরণ পথ রুদ্ধ করবার জন্যই তাদের তখ্‌তের ভিত্তি স্থাপন করলো এ দেশের হিন্দু-মুসলমান বিভেদের উপর। হাজার বছরের পরাধীন হিন্দু জাতি নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষোভ বৃটিশের সমর্থনে চরিতার্থ করবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো।

মুসলমানরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা হারালেও প্রথম অবস্থায় মনের দিক দিয়ে তা আত্মস্থ করতে পারছিলো না। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনচেতা মুসলমান জাতি

তা পারেও না। তারা একদিক দিয়ে বৃটিশের ভাষা ইংরেজি যেমন বয়কট করলো, অপরদিক দিয়ে বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ করে ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়নের আয়োজনও করতে লাগলো।

হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এ দেশকে 'দারুল হর্‌ব' কলে ফতোয়া দিলেন। তিনি জিহাদের জন্য গোপনে মুসলিম যুবকদের সংগঠিত করতে শুরু করলেন ! এই জিহাদী উন্মাদনা সারা ভারতে বিশেষ করে উত্তর বাংলার যুবকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়। এই সময়ে পাঞ্জাবে শিখরাও সুযোগ বুঝে সেখানকার মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয়, অমানবিক অত্যাচার করছিলো। হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী পাঞ্জাবের শিখ দমনের জন্য এই সমস্ত যুবক ও আলিম-ওলামা সমন্বয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া হয়তো তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি, তাই তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের শিখ দমনের উদ্দেশ্যে বালাকোটে সমবেত হন। পাঞ্জাব দখলের পরই তিনি হয়তো বিক্ষিপ্ত মুসলিম সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে বৃটিশ বিতাড়নের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন।

১৮৩১ সালে মে মাসে বালাকোটে হযরত সৈয়দ আহমদের শাহাদত বরণের পর উপমহাদেশ থেকে জিহাদী উন্মাদনা তো কমেইনি বরং বৃদ্ধি পায়। এবং শতাব্দীকাল ধরে সীমান্ত প্রদেশে মুজাহিদগণ বৃটিশ শক্তির মোকাবিলায় নিয়োজিত ছিলেন।

ইতোমধ্যে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মক্কা হ'তে ফতোয়া আমদানী করে। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবও এই ফতোয়া সমর্থন করেন। এ ফতোয়ায় এ দেশকে তারা 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যা দেন। হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী 'দারুল হর্‌ব' বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। ইসলামী শরীয়তে 'দারুল হর্‌ব' ও 'দারুল ইসলাম' এ দুটি কথারই উল্লেখ আছে। 'দারুল হর্‌ব' অর্থ 'যুদ্ধের স্থান'। 'দারুল হর্‌ব' ঘোষিত হলে, হয় জিহাদ করতে হবে অথবা সে স্থান থেকে হিজরত করতে হবে। মক্কার ফতোয়া এবং মওলানা কেরামত আলীর ফতোয়াতে এ দেশকে 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ এখানে নামায, রোযা, জুম'আ-জামাত, কোরবানী প্রভৃতিতে কোন বাধা নেই। যেহেতু এদেশ 'দারুল ইসলাম' এ কারণেই জিহাদেরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

এরপর মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবকে বাংলায় ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারে মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। তৎকালে দুদুমিয়া 'পরাধীন দেশে জুম'আর নামায জায়েয নয়' বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। হয়তো এর মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরেজ বিতাড়ন ও স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রেরণা সঞ্চার। জিহাদী মনোভাব ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিরই এক উন্নত বিকাশ। মওলানা কেরামত আলী সাহেবকে

বাংলার যুব শক্তির এই জিহাদী প্রেরণা কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক অর্থাৎ যিকির-আস্‌কার, নামায-রোযা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক খাতে প্রবাহিত করবার জোর প্রচার পরিচালনা করতে দেখা যায়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুসলমান জাতিকে ভারতে টিকিয়ে রাখতে হলে ইংরেজের সাথে সহযোগিতা ও রাষ্ট্রভাষা ইংরেজির চর্চা অপরিহার্য ; সেহেতু স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ স্বজাতিপ্রাণ মনীষীকে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতে হিন্দু-মুসলমান—এই প্রধান দুটি জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো হিন্দু। কাজেই তাদের সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেই মুসলমানদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। তজ্জন্য শাসক ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতা বর্জন করে, সহযোগিতা সৃষ্টির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভারতের ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবে, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঘটাবে। হিন্দুদের পক্ষে প্রভুর পরিবর্তন কোন বেদনার কারণ তো ছিলই না ; বরং বিজেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগে থেকেই অধিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতালাভের সুযোগ গ্রহণ করা ছিল খুবই স্বাভাবিক। রাজ্যচ্যুত মুসলমান জাতিকে কেবলমাত্র অস্ত্র বলে যে অনুগত করা যাবে না এটা বৃটিশ সরকার ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই এ জাতিকে মানসিক নির্জীবতার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য জাতির প্রাণশক্তি যে শিক্ষা, সেখানেই চক্রান্তের জাল পাতা হলো।

আগেই উল্লেখ করেছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর সুচতুর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম দিকে শাসক গোষ্ঠী এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তিকে তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যের সুবিধার্থে ব্যবহার করেন। এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হলে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেল। এ সময় মুসলমান জাতিকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বৃটিশ সরকার মাদ্রাসায় হাদীস, তফসীর ও অতীতের গ্রীক ফিলসফি পড়ানোর ব্যবস্থা করে।

কারো বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ইসলামের বিশ্বনন্দিত বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা বিজিত শাসক গোষ্ঠীর থাকতে পারে না। তজ্জন্যই এই মাদ্রাসার সিলেবাসে অংক, এ্যালজাবরা, জ্যামিতি, ভূগোল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান—মোটকথা সকল বৈষয়িক বিষয়াদি সযত্নে পরিহার করা হয়। শুধু তাই নয়, মুসলমান সমাজকে সচেতনভাবে কালের গতিধারা থেকে বিযুক্ত করার জন্য অতীতের গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হয়। এতে চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তারা

পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়লো। অর্থকরী, বৈষয়িক বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিবর্জিত মাদ্রাসাসমূহে অধ্যয়ন করে মুসলমানগণ বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতায় বারবার হেরে যেতে লাগলো। দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে লম্বা টাইটেল বা উপাধি নিয়ে পবিত্র শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে পার্থিব জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এরা নিদারুণ অসহায়তার শিকারে পরিণত হলো। ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান সমাজে এরাই তখন শিক্ষিত শ্রেণী। এদের উপরই বাদবাকি মুসলিম জনসাধারণকে সকল ব্যাপারে নির্ভর করতে হতো। কাজেই পার্থিব জীবনে যাদের নিজেদেরই পায়ের তলায় মাটি নেই, তারা সমাজের ভার কতটুকু বহন করতে সক্ষম! মুসলিম সমাজকে সাফল্যের সাথে সামনের দিকে পরিচালনায় তারা যে ব্যর্থতার পরিচয় দেবেন তাতে অবাক হবার কি আছে।

জাতির এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত এই মাননীয় ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসায় ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ না করেও নিজেদেরকে নায়েব-এ-নবী এবং মুসলমানদের নেতৃত্বদানের একমাত্র অধিকারী বলে মনে করতেন। আর সর্বহারা, দরিদ্র ও সাধারণভাবে অশিক্ষিত মুসলমানরাও তাদেরকেই ইসলামের ধ্বজাবাহী বলে মনে করতো। এই সব ওলামায়ে-কেরামের ধর্মের বিনিময়ে উপার্জন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও ছিল না। ধর্মান্ধ জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিক পরিদৃষ্ট হয়। এদের প্রচারের ফলে সাধারণভাবে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে বাস্তবমুখী বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি আরো অনাগ্রহের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিস্থিতির জন্য মাদ্রাসা বা আলিম সমাজ দায়ী নন। প্রকৃতপক্ষে, মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসই এর জন্য দায়ী। এটাও স্বীকার করতে হবে, এহেন মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেও বেশ কিছু সংখ্যক আলিম দেশ ও জাতির জন্য বিরাট অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু তা ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব মনীষী প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সক্রিয় অধ্যবসায়—তাঁদেরকে এহেন যোগ্যতার অধিকারী করেছিল। এটা আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির নির্গলিত ফল নয়।

বিজেতা বৃটিশ জাতির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। এই অসহায় মুসলমান জাতিকে উদ্ধারের জন্য যাঁরা জীবনের আরাম হারাম করে চেষ্টা করতে ছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় বহুলাংশে বাধার সৃষ্টি করেন উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই। এসব অভ্যন্তরীণ বাধা অতিক্রম করে জাতি মনজিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম না হলেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। এ বাধা আজো আমরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারিনি।

বৃটিশ সরকার মুখ্যত ভারতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গোলাম বা বশংবদ ক্যাডার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিতদের মধ্যেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার স্পৃহা জন্ম নিল। তারা আধুনিক জ্ঞান-

বিজ্ঞান, রাজনীতি ও বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং বিভিন্ন স্বাধীন দেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করলেন। এহেন শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের আগমন অনেক বিলম্বে, অনেক মন্থর গতিতে। এবং সংখ্যায়ও নিতান্তই অল্প। হিন্দুরা ইতোমধ্যে শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রায় সর্বাধিকার লাভ করেছে। তাই কার্যত মুসলমানদের এক নম্বর প্রভু ছিল বৃটিশ এবং দুই নম্বর প্রভু ছিল হিন্দু। মুসলমানদের উপর এই দুই নম্বর প্রভুর প্রভুত্বই ছিল অসহনীয়।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্দশা যে আরো অধিক ছিল তা বলাই বাহুল্য। জায়গীরদারী, আয়মাদারী ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে মুসলমান বর্ধিষ্ণু ও মধ্যবিত্তদের দীন-কাঙালে পরিণত করা হয়েছিল। সাধারণত প্রজা বলতে মুসলমানদেরই বুঝাতো; আর জমিদার বলতে হিন্দু। ঠিক এমনিভাবে খাতক বলতে মুসলমান আর মহাজন বলতে হিন্দু। এ রকম সম্পর্ক প্রাত্যহিক সকল প্রকার কার্যকলাপেই পরিলক্ষিত হত।

রাজনৈতিক প্রতিশোধ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রাখা—এসব না হয় সহ্য করা যায়, কিন্তু জাতিগতভাবে হিন্দুরা যে মুসলমান জাতিকে ঘৃণা করতো তা ছিল একেবারেই অসহনীয়। বিশ শতকের প্রারম্ভের একটি ছোট্ট ব্যক্তিগত ঘটনা মনে পড়ছে।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমাদের ক্লাশে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র দু'তিনজন মুসলমান। একদিন আমাদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র ভট্টাচার্য ক্লাশে এসে ছাত্রদের খাতা দেখতে আরম্ভ করলেন। যার খাতা তার পেনসিল দিয়েই তিনি দস্তখত করছিলেন। আমার খাতা দেখার সময় এল। তিনি মুখের দিকে না তাকিয়েই আমার পেনসিল নিয়ে দস্তখত করলেন। পেনসিল ফেরত দেবার সময় আমাকে দেখেই তিন যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন! দ্রুত ক্লাশ ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে 'রঘু'-'রঘু' বলে চিৎকার করে এক ঘটি জল চাইলেন। তারপর ভালো করে হাত ধুয়ে ক্লাশে এসে বসলেন।

আমার তখন মনে হচ্ছিল যে, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় যদি ঐ পেনসিলের সরু দিক দিয়ে আমার বুকে আঘাত করতেন, তাহলেও কয়েকদিনের মধ্যে সে ক্ষত শুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি হাত ধুয়ে যে আঘাত করেছিলেন, তার ক্ষতচিহ্ন মুছবার নয়। এ রকম আঘাত একজন, দু'জন নয়, বহুজনের বুকেই লেগেছিল। অবশ্য এ ঘটনার ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়।

যাহোক, স্বাধীনতা হরণকারীকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারের জন্য মুসলমান জাতি জিহাদ ঘোষণা করেছিল। অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তারা জিহাদ পরিচালনা

করেছিলেন এবং সানন্দে শাহাদত বরণ করছিলেন। মুজাহিদরা প্রধানত বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নানা স্থানে পরাজয়ই বরণ করেননি, নানা প্রকার ক্লেশ, নির্যাতন ভোগ, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিধ্বস্তও হচ্ছিলেন। একদিকে স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা, অপরদিকে বৃটিশের ষড়যন্ত্র, দেশী-বিদেশী ফতোয়ার আমদানী ও উদ্দেশ্যমূলক বাস্তব বর্জিত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি ঝিমিয়ে পড়ল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের চেয়ে বাস্তব বা বৈষয়িক শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর হয়ে হিন্দু জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ করলো। সামগ্রিকভাবে মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির সঙ্গে এই স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় যোগদানে ইতস্তত করছিল। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাই এর কারণ। তারপর অবশ্য কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহবানে মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেখা দিতে লাগল। মুসলমানদের সকল দাবিই নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিসঙ্গত ছিল তা আমি বলছি না। কিন্তু মুসলমানদের যুক্তিসঙ্গত দাবিকেও সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যা দেয়া হত। অথচ হিন্দুদের কোন কোন এক তরফা দাবিকেও 'জাতীয়তাবাদের আওতাভুক্ত' বলে গণ্য করা হত। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অন্যতম প্রবক্তা জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দুদের গোঁড়ামির জন্য সর্বশেষে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পরেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে দর কষাকষি ও বাদানুবাদ আরম্ভ হয়।

মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া নিয়ে এবং কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানদের অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হিন্দু জাতির সাম্পদায়িক দাবি-দাওয়া নিয়ে দর কষাকষি করতে থাকে। এর আগেই সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা মনে হলে শিহরণ জাগে এবং মনে হয়, সত্যিই ভারতের মাটি থেকে মানবতা যেন দুই পক্ষ বিস্তার করে উড়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারত বিভক্তি ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না। ইসলামের দৃষ্টিতে এই বিভক্তি সঙ্গত কিনা এবং রাজনৈতিক দিক দিয়েই এই বিভক্তি সঙ্গত হয়েছে কিনা এসব আলোচনার জের এখনো রয়ে গেছে। তবে চাক্ষুস পরিদ্রষ্টা হিসেবে বলতে পারি ঃ তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সঙ্গত হোক আর অসঙ্গত হোক—ভারত বিভক্তি ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না।

যাহোক, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি ভিত্তিক মতামতের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশ বিভাগ হলো। এর এক অংশের নাম হলো পাকিস্তান, অপর অংশের ভারত নামই বহাল

রইল। ইসলামের নামে যে পাকিস্তান আদায় করা হলো, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সেই পাকিস্তানে ইসলামের মৌলিক নীতি বাস্তবায়নের কতটুকু চেষ্টা করা হলো? জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েই প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্বীকার করলেন, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান সকল নাগরিকই জাতি হিসেবে এক—পাকিস্তানী জাতি। এতে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি রূপান্তরিত হয়ে গেল। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কুরআন-সুন্নাহ্র অনুকূলে হতে হবে—এ ব্যাপারে প্রায় সকল মুসলমানেরই অভিন্ন মত ছিল। গণপরিষদে বার বার খসড়া শাসনতন্ত্র রদবদলের পর ১৯৫৬ সনে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানে'র যে শাসনতন্ত্র পাস করা হলো, তার প্রারম্ভেই এই শাসনতন্ত্রের সকল ধারা কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক হবে বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রে কুরআনের সরাসরি বিরোধী বহু ধারাও সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন ঃ সুদ, মদ, গাজা, আফিম, জুয়াখেলা প্রভৃতি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হারাম বস্তু ও কার্যকে অবৈধ ঘোষণা করা হলো না।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুটি অঞ্চলকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু, মাঝখানে এই দেড় হাজার মাইল এলাকা জুড়ে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান থাকায় বাস্তবে এই দু'টি এলাকাকে পরস্পরের সন্নিকট করার কোন পার্থিব ব্যবস্থাও ছিল অসম্ভব, অবাস্তব। তবু, উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে আমরা হয়তো একই রাষ্ট্রের আওতায় টিকে থাকতে পারতাম। আর এই ঐক্যের মূলমন্ত্র হতে পারতো আল্-কুরআনের প্রধান নির্দেশ—সুবিচার। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬ জন। আল্-কুরআনের মৌলিক নীতি ও গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ লংঘনপূর্বক পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ঢাকায় রাজধানী না করে করাচীতে পাকিস্তানের রাজধানী করা হল। ফলে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল শুধু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা অধিক ভোগ করতে থাকল তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি সকল ক্ষমতা হরণ করে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি বঞ্চিত কালোনীতে পরিণত করা হল। যে বৈষম্যের অপরিহার্য পরিণতিতে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল; পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানেও ততোধিক ঘৃণ্য বৈষম্য সৃষ্টি করলেন।

যা হোক, ইসলামের নাম সম্বল করে যে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছিল, সেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের কথা তো আগেই বলেছি। শুধু শাসনতন্ত্রেই নয়, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বাদ দিলেও ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কি আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল? দীর্ঘ ২৩ বছর শাসনের পরও অন্তত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৃটিশ প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যা

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে এ জাতির জীবনে দুর্যোগ সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার ছিল ; দেশ গঠনের জন্য ইসলামের খাঁটি শিক্ষার জন্য, সেই শিক্ষার কোন রকম পুনর্বিন্যাসেরই ব্যবস্থা করা হয়নি। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানের একক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনো কখনো পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন বড় মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে বিরাট অংকের অর্থ অনুদান হিসেবে দিয়ে তাদের অনুকূলে ফতোয়া আদায় করে নিতেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৃটিশ যেমন সুদূর মক্কা থেকে এবং এই উপমহাদেশের কোন কোন খ্যাতনামা আলিমের ফতোয়া ক্রয় করে এদেশে তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করতেন, পাকিস্তানের তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীও পূর্ব পাকিস্তানকে স্থায়ী কলোনীতে পরিণত করার জন্য এদের সাহায্য বা ফতোয়া যোগাড় করতেন।

মোটের উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই মাদ্রাসাসমূহের সিলেবাস পরিবর্তন বা উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন সাধনেরই চেষ্টা করেননি। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিম-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের সৃষ্টি করলেন। এর অপরিহার্য পরিণতিতে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান যখন স্বাধীন, সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে, তখন শাসকগোষ্ঠী মাদ্রাসাসমূহের ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদেরকে অংশীদার করবার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। আর মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভেতর যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য যাই থাক—পূর্ব পাকিস্তানকে যারা চিরস্থায়ী কলোনীতে পরিণত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, তা ছিল তাদেরই অনুকূলে। তজ্জন্য এই সব মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমগণকেই একমাত্র দায়ী করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (এ দেশে তাদের শাসন বলবৎ রাখার জন্য) যে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, তা-ই এজন্য দায়ী। এই সিলেবাস পরিবর্তন না করবার কারণ—বৃটিশ-শাসকদের উদ্দেশ্য ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—চিন্তার স্বাধীনতা। আর চিন্তার স্বাধীনতাই জ্ঞান বিকাশের প্রধান সহায়ক। কিন্তু এর পরিপন্থী শিক্ষার মাধ্যমেই বৃটিশ পার্থিব জগতে আমাদের অগ্রগতির পথকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমাদের এই দুর্গতিপূর্ণ জীবনের

সমালোচকের অভাব ছিল না। কিন্তু এই দুর্গতির মূল উৎস্য সন্ধান এবং তা থেকে উদ্ধারের তেমন কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা কেউ গ্রহণ করেননি।

আল-কুরআন নিজের জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা দ্বারা আল্লাহ্‌র বাণী হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য অসংখ্যবার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী শাশ্বত, চিরন্তন। আল-কুরআনের মতে প্রলয়কাল অবধি তা কার্যকর থাকবে। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণার পরিবর্তন ঘটবে। পরিবর্তিত জ্ঞান ও চিন্তা অনুযায়ী আল-কুরআনের সুন্দরতম অর্থ ও উদ্দেশ্য যুগোপযোগী করে সর্বযুগের মনীষীগণ বুঝতে সমর্থ হবেন। কোন যুগের কোন মহাপণ্ডিত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা মতবাদ প্রকাশ করেছেন, তার সবগুলো সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আল্লাহ্‌র বাণী যেমন চিরন্তন, শাশ্বত, আল্লাহ্‌র বান্দার কোন অভিমত বা ব্যাখ্যা সেইরূপ চিরন্তন বা শাশ্বত হতে পারে না। প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষায় প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্তার স্বাধীনতা না থাকায় আমরা এই সরল নীতিটুকু স্বকল্পিত কূটতর্কের মাধ্যমে অনেকেই অস্বীকার করে থাকি। এরূপভাবে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ফলে পরবর্তীকালে অনেক মনীষী, মহাজনের বাণী এবং অসংখ্য কাহিনী ও অলৌকিক কার্যকলাপে বিশ্বাস করে নিজেরা যেমন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, ততোধিক জনসাধারণকে অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহারে অনীহা জন্মিয়ে দেই। ফলে ধর্মীয় খুঁটিনাটি, মতবিরোধ বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী আলিমদের মাধ্যমে জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মৌলিক মতবাদ এবং জাতিকে জীবিত রাখার মূলনীতি পার্থিব জগতে আমাদের কর্তব্য-কর্মে যেমন সহায়ক, তেমনি পারলৌকিক জগতে কল্যাণ লাভেরও এটাই একমাত্র পথ। অথচ বাস্তবে এই পবিত্র, সুষ্ঠু পথের পরিবর্তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতি বা মতবাদকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষা সমাপনান্তে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সংসার জীবনে প্রবেশ করে, জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম উপার্জনের ক্রিয়া-পদ্ধিতিতেও অনভিজ্ঞ থাকার দরুন একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। জীব মাত্রেরই জঠর জ্বালা নিবারণ প্রাথমিক অপরিহার্য কাজ। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী শ্রমকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তিনি নিজ হাতে অকুণ্ঠ চিত্তে কাজ করতে গৌরববোধ করেছেন ; এমন কি, তাঁকে নিজ হাতে সেলাই—বস্ত্র সেলাই, জুতো সেলাই এবং ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি কাজও করতে দেখা গেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করার পরে, ঘরে ফিরে কৃষি কাজ বা শ্রমিকের কাজ করতে আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগতো। ফলে এদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ধর্মের বিনিময়ে কোন না কোন পথ খুঁজে বের না করে আর কোন গত্যন্তর থাকতো না। অর্থের বিনিময়ে মসজিদের ইমামতি, বিয়ে পড়ানো, জানাযা পড়ানো, ফতোয়া দান, তাবিজ-কবজ লেখা, ঝাড়-ফুঁক দেয়া, কুরআন শরীফ খতম পড়া, কবর

যিয়ারত করা ইত্যাদি কাজগুলোকেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হত। যাদের বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল, কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত, ধর্মীয় অলৌকিক কাহিনী সাধারণের রুচিসম্মত করে বর্ণনা করতে পারতেন, তাদের দাওয়াতও বেশি হত এবং উপার্জনের পরিমাণও কিঞ্চিত অধিক হত। বলা বাহুল্য, এদের বদৌলতেই ইসলামে পৌরহিত্য প্রথার সৃষ্টি হয়। এবং সাধারণ মানুষ প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়।

অতীতে ইসলামে বহু ওলী-আল্লাহ্, বুযুর্গ, সাধক, পীর অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁদের স্মৃতি মহাজনদের হৃদয়ে আজও যেমন জাগ্রত আছে, ইতিহাসেও তেমনি তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করছে। এই সব মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাঁরা আল কুরআনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং শেষ নবীর আদর্শও পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করতেন। কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নিজেকে অবনমিত করেননি, কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, ওয়াদা খেলাপ করেননি, কপটতার আশ্রয় নেননি, গীবত বা পরনিন্দা করেননি। আল্লাহ্ তথা সত্যের জন্য তাঁরা নিজকে কুরবান করেছেন। মহানবী (সা)-এর আদর্শ তাঁরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত কখনোই আরাম-আয়েশ বা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হননি। তিনি সমস্ত জীবনে একদিনও পেট পুরে আহার করেননি। তাঁকে সাধারণত মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করতে দেখা যেতো না। অনেক সময় তালি দেওয়া বস্ত্রও তাঁকে পরিধান করতে দেখা গেছে। তিনি যে কাজ নিজে করেননি, তা অন্যকেও করতে বলেননি। তিনি সবার সঙ্গে বসে আহার করতেন। নিজে কম খেতেন, অপরকে বেশি করে আহার করাবার চেষ্টা করতেন। তিনি কখনো কারো নিন্দা করেননি। তিনি যখন তাঁর দন্ত ভঙ্গকারীর ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'হাত জুড়ে প্রার্থনা করতেছিলেন, তখন তাঁর নিজের রক্তে অঞ্জলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তাইয়েফে লোষ্ট্র নিক্ষেপে তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শোণিত গড়িয়ে পড়ছিল ; তিনি এক বৃক্ষতলে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে যখনই সংজ্ঞালাভ করলেন, তখনই তিনি দয়াময় আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

"হে আমার প্রভু, যারা আমার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছে, তুমি তাদের ক্ষমা করো। কেননা, তারা জানে না যে, আমি তোমার রাসূল।" (আল হাদীস)

জনৈক যুবক একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত চুম্বন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন। যুবকটি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আমার হস্ত চুম্বন করলেন!"

বিশ্বনবী (সা) বললেন ঃ

"তুমি যে আমার হস্ত চুম্বন করলে !"

যুবকটি বললেন ঃ

"আমি 'আদব' করে চুম্বন করেছি।"

আদর্শ নবী (সা) বললেন ঃ

"আমিও বেআদব নই।"

মোট কথা যিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ যত অধিক প্রতিপালন করবেন এবং আদর্শ নবীর আদর্শ যাঁর কর্মের মধ্যে অধিক প্রতিফলিত হবে তাঁকেই আমরা আল্লাহ্‌র ওলী, বুযুর্গ, হাদী বা পীর বলে সম্মান করবো।

কাজেই, জনগণের মধ্যে আলিমগণ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং আখেরী আদর্শ নবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করতেন, তাহলে ইসলামের নামে ভণ্ডপীর, মেকী দরবেশরা এই দরিদ্র সমাজকে শোষণ ও বিভ্রান্ত করবার সুযোগ পেতো না। কিন্তু বর্তমান বাস্তব-বর্জিত ধর্মীয় শিক্ষা লাভের ফলে এদের ধর্মের বিনিময়ে জীবন ধারণ ব্যতীত আর কোন পথ না থাকায় কুরআনের নির্দেশ ও বিশ্ব নবীর আদর্শ তাদের ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এরা তা প্রচারে সক্ষম হতে পারে না। ফলে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া এ দেশে পীরগিরির ওছিলায় ভোগ-বিলাস ও জৌলুসের মধ্যে জীবন-যাপন করছে অনেকেই। অপরদিকে তারা শুধু সর্বহারা দরিদ্র সমাজকেই দরিদ্রতার অতল তলে তলিয়ে দিচ্ছে না, ইসলামের মূলগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবীর আদর্শ হতেও সমাজকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করছে। নিরপেক্ষ উদার মনীষীগণ দয়াপরবশ হয়ে যদি তাদের দু'টি চোখ খুলে চারদিকে দৃষ্টি ফেলেন, তাহলে এর ভুরি ভুরি নযীর দেখতে পাবেন।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাস্তব-বর্জিত ধর্মীয় শিক্ষা যেমন কোন জাতি গঠনে সমর্থ নয়, ধর্ম বর্জিত বাস্তব শিক্ষাও তেমনি কোন নিষ্কলুষ জাতি গঠনে সমর্থ নয়। কাজেই, ধর্ম বর্জিত বাস্তব শিক্ষা বা বৈষয়িক শিক্ষা জাতির অগ্রগতির পথে কত অমানবিক কুকাণ্ডের সৃষ্টি করে, তা সর্বজনবিদিত। সেই হেতু ধর্ম ও বাস্তব শিক্ষার সমন্বয়ই মানবের সুষ্ঠু নৈতিক চরিত্র গঠনে সমর্থ। যে জাতির ভিতরে নৈতিক চরিত্রহীন লোকসংখ্যা যত বেশি, সেই জাতিই তত অনুন্নত। জাতিকে উন্নত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ জনগণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন।

শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ, আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের জন্য স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য একদল মাধ্যম দাঁড়িয়ে যায়। অথচ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের আত্মিক উন্নয়নে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম নেই। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামেও পৌরহিত্য প্রথা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামের সনাতন যুগে দেখা যায়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও বৈষয়িক

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পৃথক কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ইসলামের পণ্ডিতগণকে স্বর্ণযুগে সর্বক্ষেত্রে মুকুট মণিরূপে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ শিক্ষা সময়োপযোগী করার উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করবার কোন পরিকল্পনা তাতে দেখা যায় না। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার সময়োপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই ছিল অধিক। তৎকালীন সরকারের সহযোগিতায় শিক্ষা কমিশনের একটি শাখা কমিটি[১] বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা--মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাস সংস্কার করত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান—বৈষয়িক বিষয়াদি সংযোজন করে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ঐতিহাসিক সংস্কার সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণের পশ্চাতে যাঁদের সক্রিয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে তাঁরা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বহু বাধা-বিপত্তি পার হয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি (বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা)-এর প্রদত্ত সুপারিশসমূহ[২] নীতিগতভাবে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে

---

১. শিক্ষা কমিশনের ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. মুহম্মদ ইসহাক, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, জনাব আহমদ হুসাইন, জনাব আকবর আলী, শামসুল উলামা মওলানা বেলায়েত হুসাইন, মওলানা এম. জালালুদ্দীন এম.এম.এম.এ., মওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং বর্তমান লেখক এই কমিটির সভাপতি ও মওলানা আলাউদ্দিন আল আযহারী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

২. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য গঠিত 'শিক্ষা কমিশন' যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করিবেন, তাহা একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থারূপে পরিকল্পিত হইবে, এই কথা ধরিয়া লইয়া 'ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা' বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সুদৃঢ় অভিপ্রায় লইয়া ইহার একটি অতি খসড়া ও সাধারণ রূপরেখা কমিশনের কাছে প্রস্তাবের আকারে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতেছেন। এই সংস্থা আশা করেন যে, সংস্থা প্রদত্ত 'রূপরেখা'টি কমিশন বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন এবং ইহাকে জাতীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

(১) মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যকে দেশের গঠনতন্ত্রে বিঘোষিত মৌলনীতি চতুষ্টয়ের সহিত সুসমন্বিত করিয়া একটি নিটোল জাতি গঠনের পরিপোষক ও সহায়ক করিয়া তোলা সম্ভবপর বলিয়া আমরা মনে করি।

(২) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে 'বাংলা ভাষাকে' শিক্ষার বাহন করিতে হইবে এবং এই ব্যবস্থার প্রথম স্তর হইতে স্নাতক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল যত বৎসর হইবে এবং তাহা যতগুলি স্তরে বিভক্ত হইবে, মাদ্রাসা শিক্ষাকাল ও শিক্ষান্তরকে তত বৎসর দীর্ঘ ও তত স্তরে বিভক্ত করিয়া শিক্ষার মান, শিক্ষার কাল ও শিক্ষার স্তর প্রভৃতির দিক হইতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সম-পর্যায়ে আনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্তরের সহিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্তরটি সম্পূর্ণ এক করিয়া দিতে হইবে, তবে মাদ্রাসা শিক্ষার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ধর্ম শিক্ষার অবকাশ অবশ্যই রাখিতে হইবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সংস্থা মনে করেন, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্তরের পাঠ্যসূচি যখন রচিত হইবে, তখন এইরূপ ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ হইবে।

(৫) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে স্তর হইতে দ্বিতীয় ভাষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে মাদ্রাসাগুলিতে সেই স্তর হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 'আরবীকেই দ্বিতীয় ভাষারূপে'--আবশ্যক হইলে জাতীয় শিক্ষার সহিত সমতা

গৃহীত হয় এবং উক্ত কমিটির প্রণীত সিলেবাসও অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের মাদ্রাসাসমূহে এই সিলেবাস সরকার কর্তৃক কার্যকর করা হচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ রয়েছে। তবু প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই সংস্কারমূলক সিলেবাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে এই ধরনের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন গত দু'শো বছরের মধ্যে হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ধারা একই পদ্ধতিতে প্রবাহিত হলে তা অভিনবরূপে ইসলামের আর একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করতে পারে।

রাখার জন্য আরও একটি ভাষা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং অন্যান্য বিষয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ একরূপ রাখিতে হইবে।

(৬) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে স্তর হইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈশিষ্টায়ন (Specialization) শুরু হইবে মাদ্রাসাসমূহে সেই স্তর হইতে বাধ্যতামূলকভাবে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অথবা ইসলামিয়াতে বৈশিষ্টায়ন শুরু করিতে হইবে এবং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত অনুরূপ রাখিতে হইবে। তবে যে বিষয় শিক্ষা দিলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বৈশিষ্টায়নের পক্ষে সহায়ক হইবে, কেবল তাহারই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) জাতীয় শিক্ষার যে স্তর উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রগণ শিক্ষার নানা পথে পরিচালিত হইবে, যেমন ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি মাদ্রাসা শিক্ষায় অনুরূপ স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই ছাত্রগণকেও বিবিধ শিক্ষা লাভের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে। ইহার জন্য যে মানের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক বিশেষ বিশেষ মাদ্রাসায় বিশেষ করিয়া সরকারী মাদ্রাসায় তাহা শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৮) মাদ্রাসা শিক্ষার শেষ স্তরে যাহা এম. এ. স্তরের সমান হইবে। শুধু নূতন ও পুরতান আরবী আদব, কুরআন, তফসীর, হাদীস, ফিকহ্, উসুল, আকাইদ প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ই পড়ানো হইবে। ইহার পর এই সমস্ত বা এতদ্‌সম্পর্কীয় বিষয় গবেষণা করিবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। অধিকন্তু মাদ্রাসাগুলিতে কুরআন ও হাদীস ছাড়া অন্যান্য ইসলামী বিষয় শিক্ষাদানের জন্য ইসলামী বিষয়ক গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করিয়া অথবা নতুন করিয়া লেখাইয়া লইবার জন্য একটি অনুবাদ বা সম্পাদনা বোর্ড গঠন করিতে হইবে।

(৯) এই বোর্ড মনে করে যে, শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম রচিত হইলে পর, সেই পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠ্যক্রম তৈয়ারির কাজ সহজ হইবে এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার কাজ সমাধা করা হইবে।

(১০) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ঃ

(ক) বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়া ইহার ব্যয়ভার বহনের জন্য যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হউক এবং মাদ্রাসাগুলিতে সরকারী অনুদান (Govt. AID) দেওয়ার ব্যাপারে সমপর্যায়ের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমান বলিয়া নীতিগতভাবে ও কার্যত স্বীকৃতি দেওয়া হউক।

(খ) মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে বহুপূর্বে যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় যথা, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেগুলি শিক্ষাদানের জন্য যথাসংখ্যক ও যথোপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হউক।

(১১) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বার জাতি-ধর্ম, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অভিন্ন অঙ্গরূপে পরিণত করা হউক।

বিশ্বশান্তি

সত্য, ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের দ্বারাই, আজকের বিশ্ব যে অশান্তির কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে তা সর্বাংশে দূর করা সম্ভব। তা না হলে 'বিশ্ব শান্তি'র নামে দুনিয়াব্যাপী যত আলোচনাই হোক, যত বৈঠকই বসুক, আকাঙ্ক্ষিত শান্তির প্রতিষ্ঠা কোনদিনই হবে না।

বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আজ হাঁকডাক যত শোনা যাচ্ছে, কথা যত বলা হচ্ছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে তার একভাগ কাজও কি হচ্ছে ? শুধু তাই নায়, মোড়ল শক্তিবর্গের স্বার্থান্ধতা ও আত্মকেন্দ্রিক আচরণে বিশ্বে শান্তির সম্ভাবনাই আজ বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আজ মিথ্যাচার আর কূটচালের ভাওতাবাজি বৈ কিছু নয়।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যের অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং এর ফলেই দুনিয়ার অশান্তি ও বিবাদ-বিসম্বাদও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক শক্তি অপর শক্তির সাথে যে আলোচনা ও চুক্তি করছে, পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় আবার তারাই সেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছে, সত্যকে আমল করছে না। পরাক্রমশালী দেশগুলো তথাকথিত বিশ্বশান্তির জন্য যে বিধি ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা নিছক স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধারকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হয়েই, পরবর্তী সময়ে যখনই তা নিজ স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করে না, তখনই তারা আবার মিথ্যা ও চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে নানাভাবে সাহায্য করে তাদের হিতসাধন করছে—এই বলে নিজেদের বিশ্ব সমাজের কাছে জাহির করাই বৃহৎ শক্তিবর্গের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাঁবেদার, নিগৃহীত এবং দুর্বল করে রাখাই তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

বৃহৎ শক্তিবর্গ সচরাচর মুখে যে সব মধুর বাণী শোনায় কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের আচরণ তার বিপরীত। তারা মনে করে যে, তাদের এ কূট-কৌশল দুনিয়ার

আর কেউই বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না। আর বুঝলেই বা কি ? বুঝেও অধিকাংশ সময়েই বলার বা করার কিছুই থাকে না।

বৃহৎ শক্তিবর্গের বক্তব্য ও কর্মের মধ্যে যে অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত ধরা পড়ে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ দেখা না যাওয়ার পশ্চাতে দু'টি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতার দাপট; দ্বিতীয়ত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা। সম্পদ ও শক্তির দিক দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্ব বৃহৎ শক্তিবর্গের করুণার পাত্র বৈ কিছু নয়। কাজেই বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করে বা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা নিয়ে বৃহৎ শক্তির আগ্রাসনের শিকার হওয়ার চেয়ে নিশ্চুপ থেকে আত্মরক্ষা করাই উন্নয়নশীল বিশ্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শক্তির দাপট ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক অক্টোপাশ। বৃহৎ শক্তিবর্গ সুকৌশলে প্রতিনিয়ত জাল বিস্তার করে চলেছে সারা বিশ্বে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তারা সময়-সুযোগ বুঝে অর্থাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যবস্তু, ঔষধপত্র প্রদান করে, প্রয়োজনবোধে দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে, তাকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়ে কন্‌সেসন রেটে বিক্রি বা তথাকথিত সাহায্য হিসাবে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। এবং এই সব কিছু দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ধীরে ধীরে চারদিক থেকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ফেলছে। যার ফলে, বৃহৎ শক্তিবর্গের এ কূট-কৌশল উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেকেই বুঝতে সক্ষম হয়েও প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত করতে পারছে না।

আশ্চর্যের বিষয় বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশ্ব প্রসিদ্ধ কূটনীতিকরা সর্বক্ষণ স্ববিরোধী উক্তি করে নিজেরা মনে করেন, তাদের এসব চাতুর্য অন্য কেউ বুঝতে পারছে না। এ হৃদয়হীন নির্মম চাতুর্য ও মানবতা বিরোধী কৌশল অবলম্বন করে তারা তথাকথিত বিশ্ব শান্তির স্বপক্ষে ওকালতি করে বেড়ায়। অথচ কে না জানে, এ রকম কপট আচরণের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি তো তারা আনতে পারবেই না বরং সারা দুনিয়ার শান্তিই বিঘ্নিত করবে। এবং সাথে সাথে নিজেদের ধ্বংসও নিজেরাই ডেকে আনবে।

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমে প্রত্যেকটি মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুখে যা বলবো কাজেও তাই করতে হবে।

"ওয়াদা করলে তা প্রতিপালন করতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা নিজে যা করো না, অন্যকে তা কেন করতে বল ?"

(সূরা সাফ্‌ফ ঃ ২)

তিনি সত্য বলেন না, ইসলামের পরিভাষায় ওয়াদা রক্ষা করেন না, নিজে যা করেন না অন্যকে তা করতে বলেন তাকে 'মোনাফেক' বলা হয়েছে। 'মোনফেক' কাফির হতেও জঘন্য। মানুষের সমাজ জীবন সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই 'মোনাফেক'দের দ্বারাই। এরাই মানুষের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। সর্বোপরি

মোনাফেকরাই সমাজে অন্যায় ও অসত্যের লালনকর্তা এবং সকল প্রকার অবিচার, নির্যাতন আর শোষণের হোতা।

আজ সারা দুনিয়ায় বিশ্বশান্তির প্রবক্তা হিসেবে যারা নিজেদের জাহির করছে, চরিত্র বিচারে তারা মোনাফেকদেরই দলভুক্ত। আমি মনে করি, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য মৌলিক শর্ত ঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যাচার, কূট-কৌশল ও মোনাফেকীর নির্বাসন।

ইসলামের মূল বিশ্বাস বা মূলনীতি স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ তথা সত্য-ন্যায়ে বিশ্বাস স্থাপন। সত্য-ন্যায়ের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সমস্ত সৃষ্টি তথা স্রষ্টাকে যদি ভালবাসা যায় এবং সেইমত পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা যায় তাহলেই কেবল মাত্র বিশ্বে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব।

বিশ্বনবী (সা) বলেছেন ঃ

"তুমি নিজের জন্য তাই ভালবাসবে যা তোমার ভাইয়ের জন্যও।" (আল-হাদীস)

এই মহান বাণীর তাৎপর্য ব্যাপক ও গভীর। এই বাণীটিকে বিশ্বের সকল ন্যায়-নীতি, আইন-কানুন ও আদর্শের ভিত্তি বলা যেতে পারে। একে আচরণের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বিশ্ব সমাজে সত্যের প্রতিষ্ঠা আর ন্যায়-নীতির কর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। অবসান হবে মানুষে-মানুষে, গোত্রে-গোত্রে, দেশে-দেশে সকল সংঘর্ষ আর হিংসা-বিদ্বেষের। আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বশান্তির বাস্তব রূপও তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ব্যবহার সোভিয়েত ইউনিয়ন পছন্দ করে না, অনুরূপ ব্যবহার সোভিয়েত ইউনিয়নও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত না করে ; তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যে ব্যবহার পছন্দ করে না, সে নিজেও যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনুরূপ ব্যবহার না করে, তাহলে তাদের মধ্যেকার সকল মতানৈক্য ও রেষারেষি বিদূরিত হয়ে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠা খুবই স্বাভাবিক। এই নীতি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র কেন, প্রত্যেকটি মানুষ যদি অনুসরণ করে, তাহলে সারা দুনিয়া কল্যাণের মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে।

মানবকল্যাণকে বাস্তবায়িত বা কার্যকর করার জন্য ন্যায়বিচার তথা আইনের শাসন প্রবর্তন অপরিহার্য। আইনের শাসন বলতে মানব গোষ্ঠীর জন্য একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ জীবন বিধানের বাস্তবায়নই বুঝায়। এই বিধানে সকলের জন্য একই নীতি থাকবে।

"সমগ্র মানবজাতি একই গোষ্ঠীভুক্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৩)

ভৌগোলিক সীমারেখা, বর্ণের পার্থক্য, ভাষার বিভেদ মানুষকে ছোট-বড় করতে পারে না। মানুষে মানুষে এই সমতার নীতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। আইনের দৃষ্টিতে বাদশাহ-ফকির, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর সবাই সমান।

বিশ্বনবী বলেছেন ঃ

"যাঁর হাতে আমার জীবন-মরণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আমার কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, তাহলে তারও হাত কেটে ফেলা হবে।" (আল-হাদীস)

দুনিয়াময় নানাবিধ 'সংবিধান' ও 'মতবাদ' আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু কোথাও সরলভাবে সোজাসুজি আইনের এই নীতি কার্যকর হচ্ছে কি ?

প্রত্যেকটি মানুষ দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসা, বিচার-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ বোধ প্রভৃতি জন্মগতভাবে যা যা লাভ করেছে তা লংঘন না করাকেই আমি মানবাধিকার সংরক্ষণ করা বলে মনে করি। আল-কুরআনে অতীব সরলভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্‌র প্রকৃতি তাই, যার উপরে মানবমণ্ডলীকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা রূম ঃ ৩০)

আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টি অপরিবর্তনীয় এবং এটাই চিরন্তন ধর্ম।

এই মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হলে প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত উপরোক্ত উপাদানগুলোকে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। তার ভিত্তিকে করতে হবে মজবুত।

আল-কুরআনে আছে ঃ

"তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।" (সূরা বাকারা ঃ ৩০)

আল্লাহর সৃষ্টি গুণবাচক নামের মধ্য হতে 'রব'-এর প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। 'রব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্রষ্টা, প্রতিপালক, বিবর্তনকারী। সেহেতু প্রতিপালকের প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টির প্রতিপালন ও বিবর্তনে সহায়তা করাই প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য বা ধর্ম। নিজ সাধ্যমত অপরের প্রতিপালন ও তার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা অবশ্যকরণীয়।

অতএব, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনপদ্ধতিতে মানুষের এই সহজাত ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। এবং সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাহলে মানবাধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত হবে।

মানুষের আহার, বাসস্থান ও পরিধেয়—এর সম্ভাব্য ঐক্য স্বীকার করে নেয়ার উপরই সমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এর স্বাভাবিক অর্থ এই যে আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছেদের মূল প্রবাহ বা প্যাটার্ন সকলের একই হবে। তবে বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি পরিচালন প্রেক্ষিতে এর তারতম্য অবশ্যই থাকবে। যেমন হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের

দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তাদের কর্ম পরিচালনার জন্য এগুলোর আকার ছোট-বড় করা হয়েছে। কিন্তু মূল তিনটি উপাদান—রক্ত, অস্থি, চর্ম যথাক্রমে আহার, বাসস্থান পরিচ্ছদ এদের যথাপ্রয়োজন ভাবেই রয়েছে। এই আঙ্গুলগুলোকে সমতার উগ্রমতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কেটে ফেলে তথাকথিত সমতা স্থাপন করা অস্বাভাবিকই শুধু নয়, তা আঙ্গুলগুলোকে অকর্মণ্য করারই নামান্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী তারতম্য অবশ্যই থাকবে।

আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

"আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে অধিক সংযমশীল (মোত্তাকী)।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

অধিক মোত্তাকী--এর একটি তত্ত্বগত অর্থ রয়েছে। আল্লাহ্‌র যাবতীয় নির্দেশাবলী যথা—সত্য বলা, ন্যায় বিচার করা, অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করা, এক মানুষ অন্য মানুষকে ভাই গণ্য করা ; পড়শীকে অভুক্ত রেখে নিজে উদর পূর্তি করে আহার না করা ; কাউকেও তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা--ইত্যাদি যিনি প্রতিপালন করেন, তাকেই প্রকৃত মোত্তাকী বা পরহেজগার বলা হয়। এই মোত্তাকীগণই আল্লাহ্‌র কাছে তথা সকল মানুষের কাছে অধিক সম্মানিত।

কোন বৃহৎ সৈন্যবাহিনী দ্বারা ইপ্সিত কার্য সম্পন্ন হতে পারে না, যদি না তাদের একজন দক্ষ সেনাপতি থাকে। সৈনিকদের মধ্যে যোগ্যতার মাপকাঠিতে দায়িত্ব বণ্টন করা হয় এবং অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকেই সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, এদের মধ্যে মানবিক অধিকারে তারতম্য থাকবে।

প্রকৃতির পরিপন্থী কোন নীতিই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আজকাল সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচয়দানকারী দেশের অভ্যন্তরেও তাদের অস্বাভাবিক নীতিমালার কারণে সুসংগত মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়। এসব দেশে মানবাধিকারবাদীদের জেল-জুলুম অমানুষিক নির্যাতন আর নির্বাসনের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়ে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যের স্বার্থের সংঘাত আর সংঘর্ষ লেগেই রয়েছে। অথচ এরাই আরাম হারাম করে ঝটিকা বেগে সারা বিশ্বে শান্তির অমিয় বাণীর প্রচারাভিযান পরিচালনা করে চলেছে। এই শান্তির প্রচারাভিযানের পশ্চাতে তাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। তার পরিবর্তে রয়েছে সম্পদ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বে কর্তৃত্ব লাভের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা।

উপরে আলোচিত নীতিমালা নিজে অনুসরণ না করে অস্ত্রশক্তি, কপটতা, কূট-কৌশলের মাধ্যমে তারা বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের প্রহসনে লিপ্ত। কিন্তু শান্তির প্রাকৃতিক

নীতিমালাকে স্বীকার করে নিয়ে সেগুলোকে নিজেদের কর্ম ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত না করে অস্ত্রবলে শান্তির প্রতিষ্ঠা তো সম্ভবই নয় বরং এর ফলে অশান্তি রাক্ষুসী তার বিরাট মুখ ব্যাদান করে বিশ্বকে যে গ্রাস করতে উদ্যত, তাকেই সহায়তা করা হচ্ছে মাত্র।

বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন উঠে, তাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজিত ভেদ-বৈষম্য, বর্ণ-পার্থক্য, মানবিক অধিকার বিরোধী কার্যকলাপ তারা দূর করতে পেরেছেন কি ? এই সব দেশের অধিকাংশই পবিত্র খৃস্টধর্মাবলম্বী। তাদের নিজের দেশে কালা আদমীকে সাদাদের হেয়ার কার্টিং সেলুনে বা রেস্তোঁরায় অথবা শিক্ষার পবিত্র পাদপীঠে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন কি ? এ নাহয় উপেক্ষাই করলাম, ধর্মের পবিত্র স্থান শ্বেতাঙ্গদের পবিত্র গির্জায় কালা আদমীর প্রবেশাধিকার আছে কি ?

এটাই শেষ কথা নয়। মরণের পরে সকল মানুষ যে মাটি হতে এসেছে, সেই মাটিতেই মিশে যাবে। কুলীন, অকুলীন এ ক্ষেত্রে সবাই সমান। কিন্তু হায় ! সভ্যতাভিমানী এই সব দেশে কোন কালা আদমীকে সাদা আদমীর কবরস্থানে কবর দেবারও অধিকার নেই। যদি এই ন্যূনতম সমতাবোধও তাদের নিজেদের মধ্যে না থেকে থাকে, তাহলে তারা বিশ্বে সমতা, শান্তি ও মানবাধিকারের অমিয়বাণী কিসের বলে প্রচার করেন ? কাজেই তাদের শান্তির বাণী প্রচারের পশ্চাতে কোন নীতির বল নেই। একমাত্র সম্পদের গরিমা আর অস্ত্রবলই তাদের সম্বল।

অস্ত্রবলের চেয়ে নৈতিক বল অধিক শক্তিশালী ! আল-কুরআন বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সুপথ প্রদর্শক ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, এ দীনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য।" (সূরা ফাত্হ ঃ ২৮)

সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন কুরআনের নীতিমালার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। কোন এক কবির দুটি ছত্র উল্লেখ না করে পারলাম নাঃ

"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
না মানে রাহুর আক্রমণ
একটি প্রদীপশিখা তুলিয়া ধরিলে
নীরবে সে করে পলায়ন।"

বিশ্ব আজ অশান্তির ঘনমসী অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার কামান দেগে বা অস্ত্রবলে হটানো যাবে না। আল কুরআনের নীতিসমূহের দ্বারা কার্যকরভাবে আত্মাকে আলোকিত করতে পারলে সে আলোকের দ্বারাই বিশ্বের এই অশান্তির ঘোর অন্ধকার বিদূতির করে শান্তির পূত আলোকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

দুই

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির নামে ধোঁকা, কপটতা, কূটজাল, মিথ্যাচার বিস্তার লাভ করেছে। এবং—এই সবকিছুই ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশে। ইসলাম এই ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতিকে সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্মে বিশ্বের সকল মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য, মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধানোপযোগী সকল নীতির এক আশ্চর্য মৌলিক সমন্বয় রয়েছে। ইসলামের মূল গ্রন্থ পাক-কুরআন আত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রণনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংবিধানিক ইত্যাদি নীতিমালার এক অভূতপূর্ব সমাবেশ।

এই সৃষ্টিই প্রমাণ করে যে, এর অবশ্যই স্রষ্টা আছেন। এবং সেই স্রষ্টা সকল সৃষ্টির সর্বোতভাবে এক, একক।

"তিনি আল্লাহ্ এক, একক।" (সূরা ইখলাস ঃ ১)

তিনি নাই হতে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন। সমস্ত সৃষ্টি নশ্বর, তিনি শাশ্বত।" (আল-হাদীস)

আমরা জন্মেছি আবার রূপান্তরিত হয়ে এক অজ্ঞাত জগতে মহাপ্রয়াণ করছি। এটাই 'আখেরাত' বা 'পারলৌকিত জগত'। আল-কুরআন এই পারলৌকিক জগত বা আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবার নির্দেশ দান করেছে। ইহ জগতে সৎ-কর্মশীল ব্যক্তিগণ পারলৌকিক জগতে এক মহা-কল্যাণকর শান্তির অধিকারী হবেন। এবং অসৎ-কর্মশীল ব্যক্তিগণ অকল্যাণ ও অশান্তির ভেতর অবস্থান করবে। যে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পরে সে আর কখনো ফেরত আসে না। যিনি আখেরাত বা পারলৌকিক জগতে বিশ্বাস করেন এবং তথায় আত্ম-কল্যাণ ও শান্তি লাভের আশায় সৎকর্ম করেন, তিনি পারলৌকিক জগতে এক অনন্ত শান্তির মধ্যে বিরাজ করবেন। এই কল্যাণ ও শান্তি লাভের মহান আশা স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

মৃত্যুর পর কিছুই নেই, সবই বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই বিশ্বাস যারা করে, তারা এক অসহনীয় নিরাশা ও হতাশার মধ্যে জীবন যাপন করে। তারা এই নশ্বর জগতে পার্থিব ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। এ কারণে এই নশ্বর জগতে ভোগ-বিলাসই তাদের ব্যক্তি জীবনের পরম কাম্য। লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস চরিতার্থের জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে তাদের পক্ষে ভীত না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ কারণে সকল ধর্মই মানুষের আত্মার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম মানুষের আত্মিক উন্নতি বিধানের প্রধান সহায়ক সৎকর্ম করার জন্য সর্বাধিক

তাগিদ প্রদান করেছে। বলাবাহুল্য, মানুষের মানবিক চরিত্রের পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা আত্মার উৎকর্ষ সাধন। আর তাই ধর্মের মোক্ষ উদ্দেশ্যও আত্মার উৎকর্ষ বিধান।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানবজাতির প্রসার ও উন্নয়ন যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কতগুলো বিধিবদ্ধ বিধানের প্রয়োজন হয়। তা না হলে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রাও হয়ে ওঠে বাধাগ্রস্ত, বিলম্বিত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এরূপ একটি শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান।

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনের পূর্ণতা বিধান করিলাম এবং তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিলাম আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত)।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

এই বিধানে মানুষের জীবনে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভাব্য সমস্ত সমস্যার মৌলিক সমাধান বিদ্যমান।

"প্রত্যেকটি শিশু প্রকৃতির উপরে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে তার পিতা-মাতা ও পরিবেশ তাকে বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত করে।" (আল-হাদীস)

যে প্রকৃতির উপরে শিশু জন্ম গ্রহণ করে, সেই প্রকৃতিই হলো ইসলাম। একটি শিশু জন্ম গ্রহণের পরে সকলকেই সমভাবে দেখে। কাকেও আপন-পর ভাবতে পারে না। শিশুটিকেও সকলেই স্নেহ-মায়ার চোখে দেখে। এমনিভাবে শিশুটিকে আপন-পর, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির স্পর্শ থেকে সংরক্ষিত করে লালন-পালন করা সম্ভব হলে, সেই শিশুটির পক্ষে জন্মগতভাবে স্নেহ-মায়া, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠা সম্ভব। তবে শিশুটি বড় হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো মৌলিক উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান। এইগুলো যাতে সৎভাবে নিজের শ্রম দ্বারা সংগ্রহ করতে পারে, তাকে সেই শিক্ষা দান করতে হবে।

"নিজের শ্রমোপার্জিত খাদ্য সবচেয়ে পবিত্র"। (আল-হাদীস)

স্রষ্টা মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ এবং স্ত্রী। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ। এই দুয়ের ভেতরে ভালবাসার এক অব্যক্ত শক্তি প্রকৃতির সর্বস্তরে প্রবাহমান। এ শুধু মানুষের মধ্যেই নয়। আল-কুরআনে পরম করুণাময় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমার সৃষ্টি প্রত্যেকটি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা নাবাহ ৮)

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, নেগেটিভ-পজেটিভ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ—সৃষ্টির জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় সবই জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এ সবই একটি নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করে যাবে। যেখানেই নিয়ন্ত্রণের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে, সেখানেই সংঘর্ষ অনিবার্য।

আদমই (মানুষ) হলো আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলিফা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্‌র 'রবুবিয়াত'-এর আদর্শের অনুসরণে মানুষও তার খলিফা বা মালিক।

'রব' হতে এসেছে 'রবুবিয়াত'। 'রব'-এর বুৎপত্তিগত অর্থ স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তনকারী।

পবিত্র কুরআনের ঘোষিত হয়েছে ঃ

"আমরা আল্লাহ্‌রই বর্ণে রঞ্জিত।" (সূরা বাকারা ঃ ১৩৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণবাচক বা বিশেষণবোধক যতগুলো নাম আছে, সেই নামের রঙে মানুষকে রঙিন হতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র গুণাবাচক নাম 'রব' উচ্চারণের সাথে সাথে নিজের অন্তরের মধ্যে এই শক্তি অর্জন করতে হবে যে, আমিও সৃষ্টির বিভিন্ন শক্তি ও উপকরণের সমন্বয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারি। এবং আমার সাধ্যমত আমি যেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে প্রতিপালন এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথাসাধ্য অবদান রাখতে পারি। অতএব, মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখাই 'রবুবিয়াত'-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

মানুষকে আল্লাহ্ যে শক্তি সমূহের অধিকারী করেছেন, খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে সেই শক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত-পা, মন-মস্তিষ্ক—মানুষকে এগুলোর অধিপতি হতে হবে। অর্থাৎ যা দর্শন করা বাঞ্ছনীয় নয়, তা দর্শন করাবো না। যা শ্রবণ করলে আমার অনিষ্ট হতে পারে তা আমি শ্রবণ করবো না। যেমন কথা বললে আমার প্রতি অপরে রুষ্ট হতে পারে তেমন কথা বলবো না। হাত-পা দ্বারা তেমন কোন কাজ করবো না, যার দ্বারা কারো অহিত হতে পারে। এসব মানবীয় শক্তি নিচয় যদি আমি আমার আয়ত্তে রাখতে পারি, একমাত্র তাহলেই আমি রবুবিয়াত-এর যোগ্য প্রতিনিধি বা খলিফা। আমার কোন অঙ্গ যদি আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে সে আমার বিদ্রোহী প্রজা। কাজেই আমার এই ইন্দ্রিয়সমূহকে যদি আয়ত্তে রাখতে না পারি, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের অযোগ্য প্রতিপন্ন হবো।

এর পরেই রবুবিয়াতের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আমার পরিবারের খলিফা বা মালিক। আমার খিলাফতের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, তিনটি পুত্র-কন্যা, একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা ও একজন বালক ভৃত্য। আল্লাহ্ যেমন তাঁর করুণা বা দয়া সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিবেশন করেছেন, যেমন তাঁর রৌদ্র দীনের পর্ণ কুটির, বাদশাহের রঙমহল, ধার্মিকের শস্যক্ষেত্র, নাস্তিকের ফলবাগান, চঞ্চল হরিণের ঝকমকে গাত্রে, হিংস্র ব্যাঘ্রের ও নিরীহ মেষের উপরে সমভাবে আলো বিকীর্ণ করে; যেমন বায়ু জল সমস্ত সৃষ্টির জন্য অবারিত; তেমনি আল্লাহ্‌র খলিফা হিসাবে আমার বৃদ্ধা মাতা, সহধর্মিণী,

সন্তান, বৃদ্ধা পরিচারিকা ও বালক ভৃত্যের প্রতি আমার দয়া, আমার ন্যায়-বিচার সমভাবে বিতরিত হবে। যদি আমি আহারে, বসনে, ন্যায় বিচারে আমার বৃদ্ধামাতা ও বৃদ্ধা পরিচারিকার মধ্যে বা আমার বালক পুত্র ও বালক ভৃত্যের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমি আমার এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অযোগ্য।

এমনি করে যিনি একটি দেশের খলিফা বা রাষ্ট্রপতি হবেন, ধনী-গরীব, দুর্বল-সবল, সকলের প্রতি তাঁর ন্যায়-নীতি, প্রেম-প্রীতি, সহমর্মিতা সমভাবে বিতরিত হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—সকলের ইত্যাদি মৌলিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান করতে হবে।

"মালিক যা খাবে ও পরবে, শ্রমিককে তাই খেতে ও পরতে দিতে হবে।"

(আল-হাদীস)

আইনের বিচার সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। স্মর্তব্য, মদ পানের অপরাধে শাস্তি দিতে গিয়ে হযরত উমর (রা)-এর দুর্বার আঘাতে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। আইনের চোখে বাদশাহ-ফকিরের কোনো ভেদাভেদ নেই।

"আল্লাহ্ অতি অবশ্য ন্যায় বিচার করতে আদেশ করেছেন।"

(সূরা নাহল ঃ ৯০)

হযরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন ঃ

"যাঁর হাতে আমার জীবন ও মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি আমার কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, তারও হস্ত কর্তন করব।" (আল-হাদীস)

হযরত উমর (রা) একদিন ভাষণ দান করতে গিয়ে নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"ঐ ফোরাত নদীর অপর পাড়েও যদি একটি কুকুর অনাহারে মৃত্যু বরণ করে, হে উমর, তজ্জন্যও তোমাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।"

কোন একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মিসরের গভর্নর হযরত উমর (রা)-এর কাছে এসেছিলেন। গভর্নরকেও হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে খেতে অনুরোধ করলেন। খাবার সম্মুখে এলো—শুধু রুটি ও লবণ। হযরত উমর (রা) স্বচ্ছন্দে খেয়ে চললেন। কিন্তু মিসরের গভর্নর খাচ্ছিলেন না। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি খাচ্ছো না কেন ?

গভর্নর বললেন ঃ

এ পর্যন্ত কোন তরকারী আসেনি।

হযরত উমর (রা) কপালে আঙ্গুল স্থাপন করে বললেন ঃ

"হায়! আমার সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা! রুটির সঙ্গে তরকারী! না জানি আমার কত নাগরিকের ভাগ্যে রুটিই জুটছেনা! হায়, মহাবিচারের দিনে আমি যখন আল্লাহ্র

নিকট জিজ্ঞাসিত হবো ঃ তোমার নাগরিকরা খেতে পায়নি, আর তুমি রুটি ভক্ষণ করেছ। তখন কি জবাব দেব!"

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন যাপনের মান ও পদ্ধতি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারের রূপরেখাও বিভিন্ন মত ও পথে কার্যকর করা হচ্ছে।

চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে এই সমস্ত নীতি যেভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল, আজও সেই নীতিগুলো হুবহু ঐ ভাবেই প্রয়োগ করতে হবে, আমি তা বলছি না। এইসব নীতির প্রয়োগ-পদ্ধতি বর্তমানের সময়োপযোগী করে ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। তবে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের উপর যে মৌল প্রাকৃতিক নীতিমালা ছিল, সেটাকেই বর্তমানে সকল নীতির ভিত্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজনীতির মর্মকথা ঃ নিজের অধিকারকে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তেমন অন্যের অধিকারকেও স্বীকার করে নেয়া। নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অন্যের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব করা চলবে না। এই সত্য যদি দুনিয়ার সকলেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতো তাহলে দুনিয়ায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ ঘটতো না। আমাদের মনের অজান্তে ধ্বংস ও অশান্তিতে এই বিশ্ব ক্রমশই জাহান্নামে পরিণত হবার দিকে অগ্রসর হতো না।

তবে এটা সত্য যে, যদি কেউ তার সত্য-ন্যায়নীতি, মানবিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, কারও উপরে আপন অধিকার চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সত্য-ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাকে অবশ্যই বাধা দিতে হবে।

> "আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু সীমা অতিক্রম করিও না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"
>
> (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

খলিফা হযরত আবূ বরক (রা) কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণের প্রাক্কালে সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন ঃ

> "তোমরা কোন নিরস্ত্রের উপর আঘাত করবে না। স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের স্পর্শও করবে না। গির্জার পাদ্রী ও ইহুদীর ধর্ম মন্দির ও তাদের রব্বিদের সম্মান করবে। কোন শস্যক্ষেত্র বা কোন ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করবে না। যখনই বিপক্ষ সন্ধি করতে চাইবে, চারদিক বিবেচনা করে তখনই তাদের সঙ্গে সন্ধি করবে। তাদের সঙ্গে যে চুক্তি হবে, সেই চুক্তি যে কোন ক্ষতির বিনিময়েও রক্ষা করবে।"

যারা অস্ত্র বলে অন্যায়ভাবে অধিকার ক্ষুণ্ন করতে আসে, তাদের সঙ্গে এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রতিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত শান্তি স্থাপনের জন্য সুন্দরতর পথ আর কি হতে পারে।

আমি এ দাবি করছি না যে, আদর্শ নবী এবং তাঁর অনুসারী কতিপয় সাহাবার পরে মুসলমানগণ সব সময়ে সুষ্ঠুভাবে এই সব নীতি অনুসরণ করেছেন। বিশ্ব ইতিহাসে এর ফলাফল লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজকের বিশ্বে বিভিন্ন মতবাদের নামে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সকল মতবাদই মৌখিক ও ভুঁয়া। একমাত্র আত্ম-স্বার্থবাদী মতবাদই বিশ্বময় প্রচলিত হয়েছে এবং আরো নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রবাদীরা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে কত ভাবেই না কপট বন্ধুত্ব স্থাপনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার এক সমাজতন্ত্রবাদী অপর সমাজতন্ত্রবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে অটল পর্বতের মতো দৃঢ় হতেও দৃঢ়তর হচ্ছে। ধর্মপন্থীরা ব্যক্তি স্বার্থ বা নিজ দেশের স্বার্থের জন্য স্বধর্মাবলম্বীদের উপরেও অস্ত্র নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। কিন্তু মজার কথা, বিশ্বের সকল জাতি জীবনের সকল আরাম হারাম করে আষাঢ় মাসে আকাশ থেকে যে ঢল বর্ষিত হয়, তার চেয়েও ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে বিশ্বশান্তির জন্য।

বিশ্বের অতি সভ্য দেশগুলো খুনের পরিবর্তে খুনকে মানবতা-বিরোধী ও মধ্যযুগীয় আইন বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু যখন মধ্যরাত্রিতে হিরোশিমার সুপ্ত জনগণ, মাতৃবক্ষে নিদ্রিত শিশু, হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির মাতা, বাক্‌রহিত মুমূর্ষু রোগীরা কাতরাচ্ছিল, সে সময় শান্তির অমিয় বাণীর প্রচারকেরাই হিরোশিমার উপর এটম বোমা নিক্ষেপ করেছিল। মাত্র আড়াই সেকেন্ডের মধ্যে হিরোশিমায় নিরপরাধ, নির্দোষ মানুষের শরীর থেকে মাংস, অস্থি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য অট্টালিকা চৌচির হয়ে ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হয়েছিল। আজও শুধু কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে বৃহৎ শক্তিগুলো এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, এসবের ঘন ঘন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীত ও সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে। শুধু তাই নয়, মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বায়ুমণ্ডল, জল—প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ মানব পরিবেশকেও বিপজ্জনক করে তুলছে। এবং এইসব বিস্ফোরণের ফলে নানা অভিনব রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে মানব সমাজ। ফলে এই বিশ্বে মানুষের জীবন ধারণ উত্তরোত্তর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, এদেরই কতিপয় গবেষক-বিজ্ঞানীকে এইসব নব নব রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে ব্যস্ত দেখা যায়। আর এই গবেষণার পেছনে ব্যয় হচ্ছে লক্ষ-কোটি ডলার। কি অদ্ভুত বালখিল্য।

অন্যদিকে মারণাস্ত্র বিস্ফোরণে ভীত না হয়ে বিপক্ষরাও ততোধিক শক্তি-সম্পন্ন মারণাস্ত্র তৈরি করছে। অত্যাধুনিক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে জলে অথবা স্থলে। সমগ্র জগত কতটুকু সন্ত্রস্ত হয়েছে তা জানি না। কিন্তু জগতের বহু শক্তি পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে এবং এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, তারাও কম বাহাদুর নয়! বিশ্বের অনেক ক্ষুদে শক্তিও আপন জনগণকে অভুক্ত রেখে, সকল সম্পদ নিয়োগ করছে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের জন্য।

আমেরিকার একটি স্কুল ছাত্র নিজ ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীতে একটি মিনি হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। সে ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে সমর্থ হবে। অতএব, পারমাণবিক শক্তির প্রসার রোধ করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শক্তিগুলো ভীষণ তোড়-জোড় আরম্ভ করে দিয়েছে। চমৎকার হাস্যকর ভাষায় এক বৃহৎ শক্তি অপর বৃহৎ শক্তিকে পারমাণবিক শক্তি অর্জন ও বিস্ফোরণ থেকে বিরত হবার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে নানারূপ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ এরা নিজে পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে থাকবে এবং অন্য দেশের বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার কালেও নিজেরা উপর্যুপরি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকবেই। এরা নিজে যা করে অন্যের ক্ষেত্রে তা নিষেধ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে না। এমন কি স্বাভাবিক লজ্জাবোধও এদের নাই। কাজেই এরা যখন যা রোধ করার চেষ্টা করবে, তখন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। এরা ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর মধ্যে যেমন শান্তি স্থাপনের মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বিবদমান উভয় পক্ষের কাছে মারণাস্ত্র বিক্রির ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফল যা হচ্ছে তা সারা বিশ্বের সম্মুখে দেদীপ্যমান।

মানুষ নিধনের জন্য হিরোশিমা, নাগাসাকি ছাড়া এটম বোমা আর কোথাও প্রয়োগ করা হয়নি। তবু কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে নিত্যই বিভিন্ন শক্তি এটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এই অর্থ সম্পদ কি তারা মানবতার অনুরোধে বিশ্বে যারা অন্ন-বস্ত্রের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদের জন্য ব্যয় করতে পারতো না ? বিশ্বের কোটি কোটি মানব সন্তান ঔষধ ও চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এদের জন্য তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে না! তারা যদি এই আকাশচুম্বী ঐশ্বর্য অনর্থক ব্যয় না করে দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত করতো, তাহলে এরা নিঃসন্দেহে বিশ্ব-মানবতার কৃতজ্ঞভাজন হতে পারতো।

তবে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে এরা যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, তার বিনিময়ে বিশ্ব কি কিছুই লাভ করছে না ? অবশ্যই করছে। আগেই বলেছি, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভস্ম বিশ্বে বায়ুমণ্ডলী দূষিত করছে। পানির ভেতরে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ অশুভ প্রতিক্রিয়ার। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির বিপর্যয় ঘটছে। বিভিন্ন

শীতপ্রধান দেশ গ্রীষ্মে বা গরমে আইঢাই করছে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের প্রকোপ যাচ্ছে বেড়ে। ভূ-মণ্ডলে উদ্ভব হচ্ছে নব নব ব্যাধি। অন্তত সভ্য জগত তার বিপুল ঐশ্বর্যের বিনিময়ে ভূ-মণ্ডলে দুঃখ-যাতনা তো বৃদ্ধি করতে সমর্থ হচ্ছে !

আপন অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য রাজনীতির যে মৌলিক পদ্ধতি ইসলাম বিশ্ব-জাহানে উপস্থাপন করেছে, একমাত্র সেই নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের বিপর্যয় ও যন্ত্রণার নিরসন ও পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সারা উন্নয়নশীল বিশ্বে আজ চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার ফলে, একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের শৃঙ্খল আরো দৃঢ়ভাবে এসব দেশকে জড়িয়ে ধরছে। কুরআন অনুমোদিত রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণের দ্বারা অতি সহজেই যে কোন প্রকার রাজনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। সম্ভব স্থিতিশীলতা আনয়ন। বিশ্ব আজ এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, যখন দেশে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন ও বিশ্বময় শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। জনগণও আজ আর সস্তা চটকদার শ্লোগান আর গালভরা বুলির রাজনীতিতে সায় দিতে পারছে না। সেদিন দূরে নয়, যেদিন ইসলাম বিশ্বে সুখ-শান্তি আনয়নের যে মৌলিক নীতি প্রদান করেছে, বিশ্ববাসী তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

আমার মনে হয়, যদি অদূর ভবিষ্যতে আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হবেই। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এজেন্সীর ডিরেক্টর মিঃ পল ওয়ার্নকি (১৯৭৭) বলেছেন যে, পারমাণবিক বোমার যুদ্ধ হলে অন্যূন চল্লিশ কোটি বা বিশ্বের শতকরা দশজন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি মনে করি, এর চেয়েও অনেক বেশি মানুষ ধ্বংস হবে। যদি ধরে নেয়া যায় যে, ভূ-মণ্ডলের অর্ধেক মানব সন্তান বিধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে ইসলামী পরিভাষায় এটাকে 'কেয়ামতে সুগরা' (ক্ষুদ্র প্রলয়) বলা যায়। তবু কেয়ামতে সুগরায় দুনিয়ার অর্ধেক মানব সন্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তখনো দু'শ কোটি মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। তখন নিশ্চয়ই পারমাণবিক মারণাস্ত্রের মহিমা একজন মানুষও উপলব্ধি করতে অপারগ হবেন না। তখন কি দেশীয়, কি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রণনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ইসলামের শান্তির ফর্মূলা নিজ নিজ বিবেকের তাগিদেই গ্রহণ করা হবে বলে আমি মনে করি। আর সেইদিনই সারা বিশ্বে সুখ ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধর্ম এবং কর্ম

ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবহারিক বা কর্ম জীবনকে সৎ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়। কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-আরাধনা পরম নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করেও যদি তার ব্যবহারিক জীবনে সর্বপ্রকার কর্ম সৎ ও সুন্দরভাবে সমাধা না করে তাহলে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তাকে ধার্মিক, সজ্জন বা সাধু মানুষ বলে স্বীকার করবেন না। ইসলামের মূল কালেমা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' শরীয়ত মোতাবেক মৌখিকভাবে স্বীকার করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ও কর্মের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত করতে হবে। কোন কথা মুখে স্বীকার করে তা যথা নিয়মে কার্যকরী না করা পর্যন্ত যেমন তার বাস্তবতা স্বীকার করা যায় না, তেমনি উক্ত কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে তাও প্রমাণিত হয় না।

ইসলামের মূল কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"–"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।" 'লা ইলাহা'র অর্থ অতীব ব্যাপক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে অবনমিত হবো না। তিনি ব্যতীত অন্য কিছুরই নিকট অবনত হবো না। একমাত্র তিনিই সব মঙ্গলের উৎস। তিনি স্রষ্টা, পালক, বিবর্তনকারী। তাঁর ইচ্ছায় আমার জন্ম ও মৃত্যু। অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ ইলাহ বা আরাধ্য নেই।

ধর্মের নির্দেশ প্রতিপালন করে চললে 'নেকী' বা পুণ্য হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'নেকী' বস্তুটি কি ? আল-কুরআন-এর ছত্রে ছত্রে এ নির্দেশ রয়েছে যে, "হে বিশ্বাসীগণ, সৎ কর্ম করো।" আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পিত ব্যক্তিগণ তাদের জীবনে ছোট-বড় প্রতিটি কাজ তাঁর নির্দেশ মতো করবে। বলা বাহুল্য, জীব মাত্রকেই বাঁচতে হলে আপন আপন জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, এই খাদ্য গ্রহণেও যেন আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অতিক্রম না করি। অর্থাৎ যে খাদ্য আমার দেহ ও মনের ক্ষতি করতে পারে তা বৈধ নয়। আবার যে খাদ্য আমার দেহ ও

মনের উপযোগী তা যদি বৈধ পন্থায় আহরিত না হয়, তাও বৈধ নয়। কাজেই, জীবন ধারণের জন্যে আমাকে বৈধভাবে জীবিকা সংগ্রহ করতে হবে। জীবিকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এই পন্থাগুলো যেন অবৈধ না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

জীবিকা অর্জনের পন্থাগুলোর মধ্যে ব্যবসাও একটি পন্থা। আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল বা বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম বা অবৈধ করেছেন। আল্লাহ্র নবী বলেছেন, হাশরের বা শেষ বিচারের দিনে সৎ ব্যবসায়ীকে 'নবী' 'শহীদ' ও 'সিদ্দিক'-এর মর্যাদা দান করবেন। অতএব, ব্যবসা হালাল হলেও অসৎ ব্যবসা হালাল নয়। সৎ ভাবে ব্যবসা করলে যেমন নেকী বা পুণ্য হবে, অসৎভাবে ব্যবসা করলে তেমনি গুনাহ্ বা পাপ হবে।

আল-কুরআনে ক্রয়-বিক্রয়ে ওজন কমবেশ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যে বস্তু বিক্রয় করা হবে, তার যথাযথ দোষগুণ বা ভালোমন্দের কথা খরিদ্দারকে জানিয়ে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। এরূপ গুণের অধিকারীকে সৎ ব্যবসায়ী বলা যেতে পারে। এমনি করে ব্যবসা কর্মের মাধ্যমে নেকী বা পুণ্য লাভ হয়। দৈনন্দিন আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, সাহায্য-সহানুভূতি, পর-দুঃখ লাঘব, জীবের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন বাস্তব জীবনাচরণে ইত্যাদি হিত-সাধন কর্মই হলো নেকী অর্থাৎ সৎকর্ম।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন ঃ

"যে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে উদর পূর্ণ করে আহার্য গ্রহণ করে, সে মু'মিন নয়।" (আল-হাদীস)

হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর বস্ত্রের ব্যবসা ছিল। তিনি তাঁর কোন একটি দোকানে দেখতে পেলেন একটি বস্ত্রের খানিকটা ইদুঁরে কেটে ফেলেছে। কোন কর্মচারী খরিদ্দারকে বস্ত্রের ঐ কাটা দিক না দেখিয়ে বিক্রয় করে ফেলতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি সেই বস্ত্রটিকে পৃথক এক জায়গায় রেখে দিলেন। কিছুদিন পর উক্ত দোকান পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সেই বস্ত্রটিকে দেখতে পেলেন না। কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বস্ত্রটি বিক্রয় করে দেয়া হয়েছে।

তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ ঐ বস্ত্রের ইঁদুরে কাটা অংশটি কি দেখিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে?

কর্মচারী উত্তরে বললো,

ঃ না।

হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র) সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ ঐ টাকা কোথায় রাখা আছে?

কর্মচারীটি টাকার বাক্স দেখিয়ে বললো,

ঃ ঐ বাক্সে।

ইমাম (র) জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ তুমি কি জানো, সেই খরিদ্দারটি কে ?

কর্মচারী বললো,

ঃ না!

তাকে কি তালাশ করে পাওয়া যাবে—ইমাম (র) জানতে চাইলেন।

কর্মচারীটি উত্তর দিল,

ঃ তাও সম্ভব নয়।

হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র) সেই বাক্সের সমস্ত অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

সততাই ব্যবসার মূলধন। "বেশি লাভ করতে চাইলে, অল্প লাভ করতে হবে।" এই মহান নীতির অনুসরণকারীরাই পার্থিব জগতে যেমন স্বনামধন্য হয়ে থাকেন, তেমনি পারলৌকিক জগতেও কল্যাণময় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। অসৎ ব্যবসায়ীকে লক্ষ লক্ষ টাকা অসৎ পথে উপার্জন করে বিরাট বৈভবের অধিকারী হতে দেখা যায়। এবং তাদের মধ্যে অনেককেই পারলৌকিক জগতে বেহেশ্‌ত-এর আশায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখা যায় এবং মাদ্রাসা ও বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত হস্তে দান করে দাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতেও দেখা যায়। এই বিত্তবানেরা পারলৌকিক জগতে মর্যাদার আসনে সমাসীন হবেন কিনা জানি না, তবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এদের অনুকূলে রায় দেয় না।

ইসলাম শ্রমের অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। স্ব-উপার্জিত খাবার সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য। ভিক্ষাবৃত্তিকে নানাভাবে হেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে ?

"যে আপন শ্রম দ্বারা জীবিকার্জন করে, ভিক্ষা দ্বারা নয়, আল্লাহ্ তার অনুগ্রহশীল।" (আল হাদীস)

দয়ালু নবী আরো বলেছেন যে, পরনির্ভরশীল ব্যক্তিকে তিনি সাফায়াত করবেন না।

সাহাবারা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, এদেরকে হাশরের দিন তিনি কেমন করে চিনবেন ?

হযরত মুহাম্মদ (সা) উত্তর দিয়েছিলেন ঃ এদের মুখে মাংস থাকবে না।

উপরন্তু, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, বিপন্নদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ধনীদের প্রতি কুরআন-হাদীসে অসংখ্যবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একদিকে ভিক্ষা করাকে যেমন অন্যায়, নিন্দনীয় ও ঘৃণার পথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অপরদিকে, দয়া-দাক্ষিণ্যের উন্নত মর্যাদার কথাও বার বার ঘোষণা করা

হয়েছে। অথচ, যে দেশে রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে, গ্রামে-বন্দরে অসংখ্য সহায়-সম্বলহীন নর-নারী, শিশু অনাহারে অর্ধাহারে অথবা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জরা-মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে জীবন যাপন করছে, সে দেশেই বিত্তশালীরা বিলাস-বৈভবে উন্মত্ত হয়ে দু'চোখ বন্ধ করে এদেরকে পদতলে মাড়িয়ে চলছে। আরেকদিকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের নাম করে, পারলৌকিক জগতের লোভ বা ভয় দেখিয়ে সরল বিশ্বাসী জনগণকে লুণ্ঠন করছে।

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল অবলোকন করবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল অবলোকন করবে।"
(সূরা যিল্‌যাল ঃ ৭-৮)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন ঃ

"একের বোঝা অন্যে বহন করবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)

আল-কুরআন-এর এই মহাবাণীসমূহ গোপন রেখে কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ী গ্রীনবোটে বা পালকিতে সওয়ার হয়ে, তাদের ভক্তদের পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে মৌখিক দোয়া-মোনাজাত প্রার্থনা করে, পারলৌকিক জগতে তাদের জন্য জান্নাত-এর ব্যবস্থার আশ্বাস দানের বিনিময়ে নগদ টাকা-পয়সা গ্রহণ করে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হচ্ছেন। এবং নিজেদেরকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখছেন। একটি দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার পূর্বে সেই শোকাতুর দুঃস্থ পরিবারের নিকট থেকে উক্ত লাশের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করে অর্থ নিতেও এদের বিবেকে বাধছে না। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা সুস্থ, সবল দেহ নিয়েও দৈহিক শ্রম না করে, ধর্ম বিরোধী অসৎ উপার্জনকে জীবন যাপনের সন্মানিত(!) পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই সব আধ্যাত্মিক পুরোহিত আরেফদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে সেই জাতির সাধারণ জনগণের অবস্থা কিরূপ হতে পারে, চিন্তাশীল স্বধর্ম ও স্বদেশ প্রেমিকগণ দয়া করে তাদের দুটি চোখ উন্মোচিত করে ডানে-বায়ে তাকালেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

কর্মহীন ধর্মের সাধারণ পরিণতি কি ? জনৈক ব্যক্তি অপর একজন লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে আদর্শ নবী (সা)-কে বললেন ঃ

"এই ব্যক্তি সারারাত ইবাদত করে এবং সারাদিন রোযা রাখে।"

মহানবী (সা) চমকে উঠে বললেন ঃ

"তাহলে সে খায় কি ?"

লোকটি বললেন ঃ

"তার ভাই ব্যবসা করেন, তিনি খেতে দেন।"

মুহাম্মদ (সা) বললেন ঃ

"তার ভাই-ই এরচেয়ে উত্তম।"

বুযুর্গানে দীন, ওলামায়ে কেরাম—মহানবী (সা)-এর এই বাণীগুলোকে কি গুরুত্ব দেন না ? এই বাণী তাদের কর্মজীবনে প্রতিফলিত করা কি উচিত নয় ? এবং এই বাণীসমূহ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা কি বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েনি ?

অপরদিকে যারা জাতির তরফ হতে আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জিম্মাদারী নিয়ে দরিদ্র জাতির জাতীয় ভাণ্ডার থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করছেন, তারা কি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন ? দেশে চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ লোকদের শায়েস্তা করার জন্য যে শাসকগণ রয়েছেন, তারা যদি স্বার্থ ও অর্থের বিনিময়ে এদেরই সহায়ক হন, তাহলে জাতির জন্য চোর-ডাকাত দুর্নীতিবাজদের চেয়েও এরাই কি অধিক বিপজ্জনক নয় ? এরা যদি ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক দায়িত্ব পালন করে যেতেন, তাহলে এই পার্থিব জগতই জান্নাতে পরিণত হতো। এবং পারলৌকিক জগতেও এরা কল্যাণকর স্থানের অধিকারী হতেন।

এই পার্থিব জগতে যা সর্বপ্রথম আর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সদ্ভাব।

"সমগ্র মানবজাতি একই গোষ্ঠীভুক্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৩)

"এক মানুষ অন্য মানুষের সমান। কেউ কারো চেয়ে ছোটও নয়, বড়ও নয়। এক আদম হতে সকল মানুষের সৃষ্টি। আদম মৃত্তিকা হতে।" (আল-হাদীস)

এই মহামূল্যবান বাণী জগতময় প্রচারিত এবং উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু এসব প্রচারকাণ্ড যদি বাক্ সর্বস্ব না হয়ে কর্মের মধ্য দিয়ে এর মহান বাণী প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে অগ্নির মধ্যে অবস্থিত এই অশান্ত বিশ্ব শান্তির শীতল ধারায় অবগাহিত হতো। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কথায় ও কর্মে কি সামঞ্জস্য আছে ?

মানবজাতির ভেতর যত অসৎ গুণ আছে, তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে, কথায় ও কর্মে অসঙ্গতি বা সামঞ্জস্যহীনতা! ইসলামের পরিভাষায় কথায় ও কর্মে যার সঙ্গতি নেই, তাকে 'মোনাফেক' বলা হয়েছে। 'মোনাফেক' 'কাফির' হতেও জঘন্য। আল-কুরআনে বিশ্বাসীগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"কেন তোমরা তা বল, যা তোমরা করো না ? আল্লাহ্র কাছে তা বড়ই দূষণীয় যা তোমরা বল অথচ করো না।" (সূরা সাফ্ফ ঃ ২৬৩)

কেবলমাত্র ভাল কথা বলা বা উপদেশ দেয়াই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং কর্মাচরণের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে তা কার্যকর করাই প্রকৃত ধর্মাচরণ।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

"তোমার মুখ পূর্ব দিকেই করো বা পশ্চিম দিকেই করো, এতে পুণ্য নেই। বরং পুণ্য হলো তারই, যে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যে সম্পদ দেয়া হয়েছে, তা তাঁরই মহব্বতে নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের মধ্যে এবং দাসত্ব মোচনার্থে বিতরণ করে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশের প্রতি গভীর মনোযোগ না দিয়ে বৈষয়িক শিক্ষাবর্জিত তথাকথিত মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জনগণের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জন পার্থিব জীবন যাপনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সর্ব শক্তির আধার, সর্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্র শেষ বাণী কুরআন মানুষের শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণাঙ্গ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন বিধান। এই মহিমাময় গ্রন্থ আমাদেরকে পার্থিব জগতে সমুন্নত রাখার পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল বিধান প্রদান করেছে। যদি মুসলমানগণ ব্যবহারিক জীবনে এর নির্দেশাবলী কার্যকরভাবে রূপায়িত করতে পারেন, তাহলে শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তারাই যে পৃথিবীতে এক শান্তি-সুখের জান্নাত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, কেবল তাই নয়, এতে করে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেও তারা সমর্থ হবেন। অথচ জ্ঞান ভাণ্ডার পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধ, মহান উপদেশাবলী এবং শিক্ষামূলক ঘটনাদির শিক্ষা সাধারণভাবে অনুসরণ না করে বৈষয়িক শিক্ষাবর্জিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পার্থিব জীবন যাপনের কর্মভিত্তিক কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ধর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের পথ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বেছে নিয়েছেন।

অন্যদিকে কুরআনের শিক্ষায় অনভিজ্ঞ জনসাধারণ ধর্মভিত্তিক কর্ম ছাড়াই কুরআন খতম পাঠ করিয়ে এর বিনিময়ে রোগমুক্তি, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, পরলোকগত স্বজনদের কবরের আযাব মুক্তি, পারলৌকিক জগতে সুখকর বেহেশত লাভের আশায় পাঠকদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে অর্থ প্রদান করে পুণ্য খরিদ করেছেন। এক শ্রেণীর কর্মবিমুখ তথাকথিত শিক্ষিতদের এটাই উপজীব্য। পবিত্র কুরআনে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ভাল করেই জানেন যে, এটা কুরআন বিরোধী কর্ম। এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত কাহিনীর কথা মনে পড়লো।

চেঙ্গিস খাঁ যখন মুল্ক বোখারা আক্রমণ করেছিলেন, তখন এই 'বালাই' হতে নাজাত প্রাপ্তির জন্য উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনীয় অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চেঙ্গিস খাঁকে বাধা দেয়ার পরিবর্তে বোখারী শরীফের খতম পাঠ করেছিলেন। পরিশেষে বোখারী শরীফও খতম হলো, মুল্ক বোখারাও খতম হলো। কি মর্মান্তিক বেদনার কথা ! যে মহাজ্ঞানী মহানবীর বাণী বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ, সেই মহানবী ইসলাম তথা সত্যকে যারা শক্তিবলে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়েছে, সত্য রক্ষার জন্য

শক্তির দ্বারাই কিন্তু তাদেরকে বাধা দিয়েছেন। এরূপ বহু যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে। এসব যুদ্ধে রাহমাতুল্লিল আলামিন স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন, যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং আহতও হয়েছেন।

অথচ আমরা কর্মক্ষেত্রে মহানবীর সেই আদর্শ অনুসরণ না করে তাঁর বাণীবদ্ধ কিতাব পাঠকে বালাহ্-মুসীবত, বিপদ-আপদ হতে পরিত্রাণ লাভের উপায়রূপে গ্রহণ করেছি।

বিশ্বের অন্যতম মহাবিদ্যালয় দেওবন্দে সাধারণ বিপদ ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য অনেকেই কুরআন শরীফ খতম পড়িয়ে থাকেন। এমন কি নওয়াব ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পবিত্র বোখারী শরীফেরও খতম পড়াতে দেখা গেছে। বিশ্ব প্রসিদ্ধ বহু আলিমের কিতাবে দেখা যায়, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে ফুঁক দিলে অথবা কবজ করে ধারণ করলে বহুবিধ রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ বিশ্বনবী বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক ব্যাধিরই প্রতিষেধক আছে।" (আল-হাদীস)

আল বেরুনী, আবূ সিনা স্বর্ণযুগের প্রমুখ মুসলিম মনীষী চিকিৎসা বিদ্যায় অভূতপূর্ব আবিষ্কার ও উন্নয়ন সাধন করেছেন ; যা আজও পাশ্চাত্য জগতের মনীষীগণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"দুল্যোক-ভূলোকে যা কিছু আছে সবই তোমাদের অনুগত করা হয়েছে।"

(সূরা জাছিয়া ঃ ১৩)

সেহেতু, আমাদেরকে বার বার জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কুরআনকে চিন্তা করতে বলা হয়েছে, গবেষণা করতে বলা হয়েছে, গওর-ফেকের করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত সৃষ্টি মানুষ। সমস্ত সৃষ্টিকে এই মানুষেরই দাস বা অনুগত করা হয়েছে। এই বিপুল সৃষ্টিকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা, গবেষণা করবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আল্লাহ্র এই বাণী গবেষণা করে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমান জাতি তৎকালে বিশ্বের আদর্শ উন্নত জাতির স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। সমরখন্দের মহাপণ্ডিত উলুগ বেগ যে মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা মুসলমান জাতির অবহেলায় মৃত্তিকার নিচে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, তখন আল্লাহ্র কুরআন সসম্মানে উর্ধ্বে তুলে রেখে মুসলিম মনীষী ও মহাপণ্ডিতগণ পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের দেয়া আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও আপন আপন চেষ্টা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা নানাবিধ মতবাদ এবং সেই সব মতবাদে একের বিরুদ্ধে অপরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত প্রচারজনিত মতভেদ ও মতবিরোধ সৃষ্টিতে সোৎসাহে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে,

আল্লাহ্‌র বাণী গবেষণায় মনোযোগ দেবার পরিবর্তে মনীষীদের অর্থাৎ মানুষের মতের গবেষণা ও টীকা-ভাষ্য নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন পণ্ডিতগণ। এই মতবিরোধের ফলশ্রুতি মুসলিম জাহানের সর্বক্ষেত্রে কি রকম বিপর্যয় ডেকে এনেছে—ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

আজ আল-কুরআন হতে অধিকাংশ মুসলমান কত দূরে নিক্ষিপ্ত! কুরআনকে আজ শুধু তাজিমের সঙ্গে পাঠ করার বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। আল-কুরআনের পবিত্রতা যে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করার জন্য, আলোকিত করার জন্য তা কি প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হচ্ছে না ?

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ যেখানে তাঁর একমাত্র রজ্জু আল-কুরআনকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করতে বলেছেন এবং নানা দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন, সেখানে যুগে যুগে স্মরণীয়, বরণীয় মনীষীগণ ইসলামকে কত দলে বিভক্ত করেছেন! এমন কি একদল অপর দলকে ইসলাম হতে বহিষ্কার করতে বা কাফির ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। আজও বহু আলিম সেই পথ অনুসরণ করে চলেছেন।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ঃ

"তোমাদেরকে যে সালাম দেয় তাকেও বলো না যে সে মু'মিন নয়।"

(সূরা নিসা ঃ ৯৪)

বস্তুত খুঁটিনাটি মতবিরোধ হলেই আমরা একে অপরকে কাফির ফতোয়া দিয়ে থাকি। খায়বারের যুদ্ধে জনৈক নবদীক্ষিত মুসলিম যুদ্ধ শেষে রাহমাতুল্লিল আলামিনের নিকট যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

"একজন ইয়াহুদী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার সঙ্গে লড়াই করছিল। এক সময় যখন সে দুর্বল হয়ে এল, তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য বলে উঠলো ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' আমি তার এই ধোঁকায় না পড়ে তাকে হত্যা করলাম।"

আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখ লাল হয়ে গেল। তাঁর কপালের শিরাটি উঁচু হয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো! তিনি বললেন ঃ

"তুমি কি সেই ইয়াহুদীর বক্ষে সিঁধ কেটে দেখেছিলে যে সে ব্যক্তি অন্তরের সহিত কালেমা বলেনি ?"

নবদীক্ষিত মুসলিমটি পরে অনুতাপ করেছিলেন ঃ

"আমি এতই ভীত হয়েছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছিল কেন এই তারিখের পরে মুসলমান হলাম না!"

অথচ কত তুচ্ছ ও ব্যক্তিগত কারণেই না আমরা একে অন্যকে কাফির ফতোয়া দিয়ে থাকি!

আল্লাহ্ তথা সত্য-ন্যায়ে বিশ্বাসী লোক দুনিয়ায় একজন অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ্র বাণীকে প্রচার করবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করো, যুক্তিপূর্ণ বাক্য এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

সত্য ও ন্যায় বিশ্বাসী যারা নয়, কোথায় আমরা তাদেরকে আল্লাহ্ তথা ন্যায় ও সত্যের পথে আহবান করবো, তা নয় উল্টো আমরা মুসলমানদেরকেই ইসলাম হতে বহিষ্কারে ব্যস্ত। যদি মুসলমানগণ ব্যবহারিক জীবনে কর্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সমঝোতা স্থাপনে সমর্থ হতো, তাহলে এ জাতি বিশ্বের আদর্শ জাতি হিসেবে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।

আনুষ্ঠানিকতাকে আমি ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করি। এই আনুষ্ঠানিকতা আমাদেরকে আত্মিক দিক দিয়ে যেমন শক্তিশালী করে তোলে, তেমনি সৎ-কর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই, আমাদের সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণার উৎস ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম। যদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কর্মক্ষেত্রে এর রূপদান না করা হয়, তাহলে তা অর্থহীন।

মেরাজ রজনীতে বিশ্বনবী (সা) যে এক অজানা জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং সর্বশক্তির আধার, সবনিয়ন্তা, জ্ঞানাতীত, ধারণাতীত আল্লাহ্র অব্যক্ত নৈকট্য লাভ করেছিলেন, তা আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি অঙ্গ। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা লায়লাতুল মেরাজ-এর তাৎপর্য অনুধাবন করে আমরা সৃষ্টির অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি। এই পবিত্র রজনীতে মহানবী অনন্ত জগতের রহস্য উন্মোচনের যে তোরণ-দ্বার জগদ্বাসীর সামনে খুলে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে জগতের মনীষীগণ সৃষ্টির অনেক রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। এবং আরো অভাবনীয় সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মুসলমান মনীষীবর্গ মেরাজ রজনীতে মহানবী (সা) আল্লাহ্র সান্নিধ্য জেসমানি, নাকি রুহানিভাবে লাভ করেছিলেন সে বিতর্কের সমাধান আজ চৌদ্দশ' বছরেও করতে সক্ষম হননি। যদি আমরা আল্লাহ্র কিতাব-কুরআন এর ভেতর তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো একত্রিত করে আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করি, তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।

আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"তিনিই আদি এবং তিনি অন্ত।" (সূরা হাদিদ ঃ ৩)

"এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।"

(সূরা হাদিদ ঃ ৪)

"আমি তার জীব শিরা হতেও নিকটে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৬)

"তোমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করো, সেদিকে আল্লাহ্র অবয়ব।"

(সূরা বাকারা ঃ ১৫)

"তাঁর তুল্য কিছুই নেই।" (সূরা শূরা ঃ ১১)

এই সমস্ত পবিত্র আয়াতেই স্পষ্ট যে, সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্ মানুষের বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সীমার অতীত। আল্লাহ্র সৃষ্টিজ্ঞান দিয়েও আল্লাহ্কে মানুষ তার জ্ঞান সীমার মধ্যে আনতে পারে না। কেননা, তিনি মানুষের জ্ঞান সীমার ঊর্ধ্বে। তিনি ঊর্ধ্ব-অধঃ, দক্ষিণে-বামে, বাহিরে-ভেতরে, তিনি সৃষ্টির সীমাতীত, ধারণাতীত। মহানবী বলেছেন ঃ

"তোমরা আল্লাহ্র জাত ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করো না, বরং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো।" (আল-হাদীস)

আমরা যদি তাঁর নিজের সম্পর্কে আল্লাহ্র বর্ণনাকে অতিক্রম করে চিন্তাতীত, বোধাতীত, জ্ঞানাতীত সেই মহামহিম আল্লাহ্কে স্থান-কাল-পাত্রে বা কোন দিকে অবস্থান করেছেন বলে নিজেরা কল্পনা করি তাহলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। অথচ আল্লাহ্র কালাম সহজ, সরল ও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলে এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের জন্য নির্দেশিত জীবন বিধান আল-কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যবহারিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে আমরা যেমন উচ্চ আদর্শের তুঙ্গে আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তেমনি পারলৌকিক জগতে মহিমান্বিত আল্লাহ্র মহা-কল্যাণ লাভেও সমর্থ হতে পারি।

ফলত ইসলামের কালেমা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ—কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী বা প্রার্থনা মানুষকে ইহলৌকিক জগতে সকল সুপথের সন্ধান দিতে সমর্থ, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও পারলৌকিক জগতের ইপ্সিত কল্যাণ নিশ্চিত করতে সমর্থ। ইসলামের স্বর্ণযুগের প্রথম দিকে মদীনার অনুসারীদেরকে যেমন ইসলামের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-পদ্ধতি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে দেখা যায়, ব্যবহারিক জীবনে তাদেরকে ততোধিক নিষ্ঠার সাথে সৎ-কর্ম করতে দেখা যায়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে খলিফা হবার পরদিনও কাপড়ের গাঁট নিয়ে বিক্রয়ের জন্য বাজারে যেতে দেখা যায়। একদিন ফজরের সালাত শেষে সাহাবাগণ

দয়ার নবীকে ঘিরে তাঁর অমিয় বাণী শ্রবণ করছিলেন। এমন সময় ক্ষণিকের জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, যে নিজের খাবার রাত্রে ক্ষুধাতুরকে দিয়েছিলে ?

সকলেই নিরুত্তর রইলেন। সবিনয়ে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি দিয়েছিলাম।" আবার আল্লাহ্‌র নবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, যে সারারাত জেগে পীড়িতের সেবা করেছো ?"

এবারও সবিনয়ে সিদ্দিক-এ আকবর (রা) বললেন ঃ

"জি, আমি।"

বিশ্বনবী বললেন ঃ

"এখনই জিবরাঈল এসে সংবাদ দিল যে, তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে এইরূপ দুটি সৎ কর্ম করেছে। তাঁকে জান্নাতের খোশ-খবর দাও।"

একদা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা) শহরতলীর বিভিন্ন পথে ঘুরছিলেন। এমন সময় এক বাড়ির ভেতর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। হযরত উমর (রা) দরজায় আঘাত করার পর বাড়িওয়ালা বিরক্তির সাথে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"কি চাও ?"

হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

"আপনার ঘরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম, তাই আপনাকে ডাকলাম। আমি কি আপনাকে কোন সহায়তা করতে পারি ?"

সে ভদ্রলোক জবাব দিলেন ঃ

"না! আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় আর্তনাদ করছে।"

হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"কোন ধাত্রী রাখেননি কেন ?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন ঃ

"আমি গরীব। ধাত্রীকে পয়সা দেবার সামর্থ্য আমার নেই।"

তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রা) সেই ভদ্রলোকের সামনে থেকে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। বাড়িতে ফিরে আঙিনায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"বেহেশ্‌ত নিলাম হচ্ছে, কে খরিদ করবে ?"

উমর পত্নী উম্মে কলসুম (রা) বললেন ঃ

"হে আমিরুল মু'মিনীন, আমি খরিদ করবো।"

উম্মে কুলসুম (রা) ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে সাথে

নিয়ে সেই বাড়িতে এলেন। বাড়ির কর্তাকে ডেকে স্বীয় পত্নী উম্মে কুলসুম (রা)-কে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে হযরত উমর (রা) ও বাড়ির মালিক বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবজাত শিশুর কান্না ভেসে এলো।

উম্মে কুলসুম (রা) বললেন ঃ

"আমিরুল মু'মিনীন, আপনার বন্ধুকে বলুন, তিনি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।"

বাড়ির মালিক হযরত উমর (রা)-কে আগে চিনতে পারেননি। ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ

"আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, আমাকে মাফ করবেন।"

উল্টা হযরত উমর (রা) তার হাত ধরে বললেন ঃ

"বন্ধু, বরং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর। তোমার স্ত্রী দীর্ঘক্ষণ প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। যথাসময়ে তার ব্যবস্থা যে আমি করতে পারিনি, তজ্জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমি জিজ্ঞাসিত হবো।"

ইসলামের স্বর্ণযুগের এ ধরনের ঘটনা বক্ষে ধারণ করে ইতিহাস বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, এসব মহাপুরুষ কি ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতি পালন করতেন না ? নিশ্চয়ই তাঁরা ইসলামের আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ কল্পনাতীত নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করতেন। তাঁদের ব্যবহারিক জীবন ছিল ; ছিল পার্থিব যাবতীয় সদাচরণ, সৎকর্ম, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি ইসলাম নির্দেশিত সকল সৎ গুণের সমাহার। তাঁরা কোন ব্যক্তি, দেশ বা জাতির প্রয়োজনে তাদের শক্তি, সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ তো করতেনই না, বরং এটাকে নিজের কর্তব্য হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে ইসলাম অনুমোদিত সৎকর্ম কার্যকর করার অনুপ্রেরণাই লাভ করতেন। যে ইবাদত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক কৃচ্ছ্র সাধন বাস্তব জগতে কর্মবিমুখতার সৃষ্টি করে তা আর যাই হোক, আল-কুরআন সমর্থন করে না। এবং তা আখেরী আদর্শ নবী (সা) ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শেরও পরিপন্থী।

আল-কুরআনের নির্দেশ ও আখেরী নবী (সা)-এর আদর্শ অতিক্রম করে যে সব সূফী-দরবেশ কিতাব লিখেছেন, যে সব বুযুর্গ কামেল পীর আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শ ডিঙ্গিয়ে বুযুর্গ হতে সমর্থ হচ্ছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। কেননা, আল-কুরআনের উপরে মানুষের জীবন-বিধান সম্বলিত কোন গ্রন্থ আছে এবং আখেরী নবীর আদর্শের চেয়ে কোন উন্নত আদর্শের লোক আছে, কোন মুসলমানই তা স্বীকার করতে পারে না।

লক্ষ লক্ষ মুসলমান একত্রিত হোক, মাইল-মাইলব্যাপী প্যান্ডেল তৈরি হোক,

তথায় লক্ষ লক্ষ টাকার আলোকসজ্জা করা হোক, বিদেশ থেকে দুয়েকজন শ্বেত মুসলমান আমদানী করা হোক, মসজিদে মসজিদে এস্তেমা বসুক, চল্লিশ দিনের চিল্লায় অন্ধকারের পাপ কোঠা হতে নূরের আলোক প্রকাশ পাক—এ সবই আশার কথা। কিন্তু এ সবই যদি আনুষ্ঠানিক হয়,—ইসলামের সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তা যদি যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে ইসলামের নামে অনুন্নত জনসাধারণকে কর্মবিমুখ করার এই আয়োজন যে কোন দেশের আশীর্বাদপুষ্ট হোক না কেন, তা আল্লাহ্‌র বাণীর পরিপন্থী।

যার শেষ নেই

পাহাড়-পর্বত, আকাশ-অরণ্য, সমুদ্র, সমভূমিময় বিচিত্র প্রকৃতির কোলে মানুষ জন্ম নেয়; কর্মমুখর জীবন যাপন করে আবার একদিন পরলোকে যাত্রা করে। কিন্তু পাহাড় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ; সমুদ্র উল্লাসে তরঙ্গ ভাঙ্গছে; সূর্য আলো ও তাপ ঢালছে ; চাঁদে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে ; নক্ষত্র জ্বলছে; অরণ্যে গাছ-পালা-লাতাগুল্ম, শস্যক্ষেত্রে ফসল ফলছে। বিশ্ব সংসারের স্তরে স্তরে প্রকৃতির এই যে বিকশিত রূপ—এর শুরু কবে; কবে পূর্ণতালাভ এবং কার জন্য ? বিচিত্র প্রকৃতির রূপ-রস, আলো-হাওয়ায় বেঁচে থাকে যে মানুষ, তার মনে এ প্রশ্ন জীবনের কোন না কোন সময়ে জাগবেই।

যুগ যুগ ধরে বহু মনীষীর চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করেছে এই প্রশ্ন। বহু দিন-রাত্রির সাধনা ব্যয় হয়েছে এর উত্তর খুঁজে পাবার জন্য। বলা বাহুল্য, দর্শনের জটিল যুক্তিজালে এর কোন সদুত্তরই আজও ধরা পড়েনি। বলা হয়ে থাকে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের সৃষ্ট বিজ্ঞানে বা 'বিশেষ জ্ঞানে'র আলোতে বিশ্ব জগতের সকল রহস্যই আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। এসব কথার পশ্চাতে যে যুক্তি নেই, বাস্তবতা নেই, তাতো নয়। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞানের সাধনা বলে মানুষ আজ অনেক রহস্যেরই দ্বার উদ্‌ঘাটন করছে। যে চাঁদ একদিন দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে বিরাজ করছিলো, আজ তা মানুষের হাতের তালুতে অবস্থান করছে। আজ মহাকাশের-মহাবিশ্বের যত গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের জ্ঞানের আওতায় ধরা পড়ছে, কিছুকাল আগেও সেসব ছিল যেমন অভাবনীয়, অকল্পনীয়, তেমনি অবিশ্বাস্যও বটে।

এই যে অনন্ত মহাশূন্য—খোলা চোখে তা শূন্য বৈ কিছু নয়। অথচ বিজ্ঞানীগণ এই মহাশূন্যকে অকল্পনীয় সৃষ্টি সম্ভারে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাচ্ছেন। সর্বাধুনিক মানমন্দির হতে তাঁরা উচ্চশক্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আজ পঞ্চাশ লক্ষ আলোক-বর্ষ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞানে আজকের যুগে মানুষের এ সাফল্য নিঃসন্দেহে এক বিরাট ব্যাপার। অতীতে পণ্ডিত-মনীষীদের কাছে যা ছিল

অজ্ঞেয়, আজ তাই একেবারে হাতের কাছের হয়ে উঠেছে। তারা যা ভাবতেই পারেন নি, তাই আজ ধরা পড়ছে মানুষের দৃষ্টিসীমায়।

এ পর্যন্ত মহাবিশ্বের যতটুকুকে বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে, তারপরেও যে আরো অভাবনীয় সৃষ্টি-সম্ভার রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্ব-সংসারের আয়তন-পরিধি মানুষের জ্ঞান সীমার বাইরেই রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এর শেষ কোথায়? বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের দিনেও এ প্রশ্নের উত্তর একটিই আমাদের জানা আছে—এর শেষ নেই। সামনে—আরো সামনে, যত সামনেই এগিয়ে যাওয়া হোক না কেন—সৃষ্টির পর সৃষ্টিই আমাদের অবলোকন করে যেতে হবে। যথার্থ শূন্য বলতে কিছুই নেই। বাস্তবিক পক্ষে, এ ব্যাপারে শেষ কথা বলতে মানুষের জ্ঞান তথা বিজ্ঞান অক্ষম।

এতো গেল মহাবিশ্বের আয়তন-পরিধির কথা। এর পর আসে এ বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টির কথা। কবে এর শুরু? পুরাতত্ত্ব বা নৃতত্ত্ব বিদ্যার জ্ঞান যেমন তার সঠিক উৎস স্পর্শ করতে পারছে না, তেমনি বিজ্ঞান পারছে না এ প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে। সৃষ্টির পর থেকে সূর্য এ যাবৎ কোনদিনই পশ্চিমে উদিত হয়নি, অস্তও যায়নি পূর্বে। তাহলে কি সূর্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই বিশেষ গতিপথে, যা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়? অনেক সময়ই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদেরও পূর্বাভাস দিতে দেখা যায় যে, অমুক সময়ে প্রদক্ষিণকালে অমুক গ্রহের সঙ্গে অমুক গ্রহের সংঘর্ষ ঘটবে। বিশ্ববাসী আতংকের সাথে সেই নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য করেছে—উল্লিখিত গ্রহদ্বয় যথানিয়মে আপন আপন কক্ষপথেই চলে গেছে। জ্যোতির্মণ্ডলে কোন সংঘর্ষই ঘটেনি।

শুধু গ্রহ-নক্ষত্র নয়—সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে। অনেকেই বলে থাকেন যে, প্রকৃতি নিজে নিজেই বিকশিত হচ্ছে। আপন শক্তিতেই এ বিশ্ব প্রবাহ প্রবাহমান। এ কথাকে যদি সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে মানতে হয়—এ বিশ্ব প্রকৃতি সজ্ঞান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কি প্রকৃতির সজ্ঞানতার প্রমাণ মেলে? মেলে না। তাছাড়া, এ সজ্ঞানতাই প্রকৃতির শুরুকে সম্ভব করেছে কিনা—এ ব্যাপারেও সংশয়মুক্ত রায় দেয়া যায় না। প্রকৃতি যদি নিজে নিজেই আবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাহলে এর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই কোন মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে। তা নাহলে একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষে এ বিশ্ব প্রকৃতি কোন কালেই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিধ্বস্ত বা বিপর্যস্ত হচ্ছে না। কাজেই একথা মানতেই হয় যে, এই বিশ্ব প্রকৃতিকে চলতে হচ্ছে একই প্রবাহে, একটি বিশেষ মহা পদ্ধতিতে—যার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অনাদিকাল থেকে একই প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি। দিবস রজনীর পরিবর্তন হচ্ছে, গ্রহরাজি আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করছে, সমগ্র সৃষ্টি একই নিয়মে যথাকর্তব্য করে যাচ্ছে। কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই, নেই কোন অনিয়ম।

কখনো কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তা প্রকৃতিরই নিয়ন্ত্রিত বিধান ভুক্ত এবং সাময়িক। যার কোন প্রভাবই প্রকৃতির মৌল সিষ্টেমকে স্পর্শ করতে পারে না। এ ব্যতিক্রম অজ্ঞাত সময়ের ব্যবধানে ঘটে বলেই তা ব্যতিক্রম বলে অনুমিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ব্যতিক্রম নয়। বরং সেই মহা পদ্ধতিরই অংশ বিশেষ। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে তা এক সুদক্ষ নিয়ন্ত্রকের দ্বারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। এ যুগের সেরা বিজ্ঞান সাধক আইনস্টাইনকেও তাই অভিভূত হয়ে বলতে হয়েছে ঃ

> "এই বিশাল সৃষ্টির পশ্চাতে থেকে যে মহাশক্তি তা সুনিপুণভাবে পরিচালিত করেছেন, আমার মত মূঢ়ের ভয়বিহবল চিত্তে তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই।"

এ বিশাল সৃষ্টির উৎস ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের দৃষ্টি যে সৃষ্টিকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে সক্ষম নয়, সেই মহাসৃষ্টি কি আপনা-আপনিই গড়ে উঠেছে ? না কি স্তরে স্তরে সাজানো এবং সুষ্ঠুভাবে আবর্তিত এ সৃষ্টির পশ্চাতে কোন সচেতন কারিগরের সযত্ন লালিত শ্রমের অস্তিত্ব রয়েছে ?

এ সৃষ্টির কথা পরেই আলোচনা করা যাক। মানুষ কেমন করে জন্ম নেয়, আবার মৃত্যুর পর কোথায় চলে যায় ?—এ প্রসঙ্গও মানুষকে কম ভাবিয়ে তোলে না। মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা সীমিত জ্ঞান দিয়ে বাইরে থেকে যা বুঝতে পারি—তা হলো, নর ও নারীর মিলনের মাধ্যমে একটি শিশুর আবির্ভাব হয়। কোন্ প্রক্রিয়ায় মানব শিশুর জন্ম ঘটে ? হয়তো বলবো, নরের শুক্র এবং নারীর ডিম্বকোষের মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের দিন থেকে দশ মাস দশ দিন পর শিশু ভূমিষ্ট হয়। নরের শুক্র কোথা হতে, কিভাবে সৃষ্ট হয় ? উত্তর আসে, রক্তের একটি প্রক্রিয়ার ফলই শুক্র। নর যা আহার করে তা থেকেই রক্ত সংগঠিত হয়। আহার্য দ্রব্য—ফলমূল, ফসলাদি আমরা জলবায়ু ও সূর্য কিরণের সংমিশ্রণ শক্তির দ্বারাই মাটি হতে লাভ করে থাকি। মাটি, জলবায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি কোথা থেকে এলো ? এসব কি আপনিই সৃষ্টি হয়েছে ?

এক ফোঁটা শুক্র বীজের মধ্যে সাড়ে চার হাজার জীবন্ত বীজাণু একটি নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে সংযোজিত হলেই নারী গর্ভবতী হয়। মাইক্রোস্কোপ ছাড়া শুক্র বীজটির অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। এতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বীজ কার শক্তিতে, কার নিয়ন্ত্রণে গর্ভাধারে বর্ধিত হয়ে দশ মাস দশ দিন পরে একটি সুন্দর মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে ? শিশুর চোখ, মুখ, কান, নাক, হাত-পা, হৃদপিণ্ড, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা সেই প্রায় অদৃশ্য শুক্র বীজটির মধ্যেই নিহিত ছিল। এ থেকে কোন স্থপতি সুন্দর মানবের অবয়ব নিভৃতে বসে গড়লেন ? যার কোথাও কোন অসামঞ্জস্য নেই,

সব কিছুই যথাযথভাবে রয়েছে এবং সবই সুন্দর, সবই প্রয়োজনীয়। কিছুই অকেজো নয়, কিছুই অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর নয়।

মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট শিশুরা পৃথক পৃথক মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। কেউ সাম্রাজ্যের অধিপতি, কেউ ভুবন বিখ্যাত বীর, কেউ দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক-ভাবুক, বিজ্ঞানী হয়ে বিচিত্র কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে একই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। খোলা চোখে অদৃশ্য শুক্রের ঐ সূক্ষ্মতম কণিকার ভেতরে এসব ক্ষমতারাজির উৎস কে সঞ্চিত করে রেখেছিল ? দর্শন ও বিজ্ঞান কেন এর সন্তোষজনক জবাব দানে অক্ষম ?

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা সম্মিলিত এ সৌরজগত। এরূপ সৌরজগত একটি দুটি নয় ; বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে অনেকগুলোই ধরা পড়েছে। আরো যে কত রয়েছে, তাও কল্পনাতীত। এই-ই শেষ নয়, আরো কত অকল্পনীয় সৃষ্টি রয়েছে। বিজ্ঞানীগণ যতই অগ্রসর হচ্ছেন, ততই তারা বিস্মিত ও হতভম্ব হচ্ছেন। একটি ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে যেমন বিজ্ঞানীগণ আদি কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কোন সমাধান দিতে পারেননি, তেমনি অকল্পনীয় বিশাল এ সৃষ্টি উৎস নির্ণয়েও সমর্থ হতে পারেননি। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই অগ্রসর হবে, ততই তারা সৃষ্টির পর সৃষ্টি—অনন্ত সৃষ্টি অবলোকন করবে। তারপরও অজানা থাকবে অপরিমিত সৃষ্টি। এ জানার শেষ নেই—সমাপ্তি নেই।

যে মহাশক্তি এই সৃষ্টিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন, সেই মহাশক্তিই সর্বস্রষ্টা। আল-কুরআন যাঁকে 'আল্লাহ্' বলেছেন। আল্লাহ্—যিনি 'রব' অর্থাৎ স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তনকারী। তাঁরই হেকমতে আমাদের জানা-অজানা সব কিছুর সৃষ্টি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণেই চলছে সবকিছু।

আল্লাহ্ বা সর্বশক্তিমানকে সসীম জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরিবৃত করা যায় না। যদি মানুষের জ্ঞানশক্তি সেই অসীম শক্তিকে পরিবৃত করতে পারে, তবেই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব। কিন্তু, মানুষের জ্ঞান যদি সেই অসীম মহাশক্তিকে পরিবৃত করতে পারে, তাহলে সে শক্তি আর অসীম থাকে না। বরং মানুষের জ্ঞান সীমার মধ্যে এসে যায়। সেহেতু তিনি জ্ঞানাতীত, চিন্তাতীত, বোধাতীত। তাঁকে যে জানা যায় না, তা জানার নামই তাঁকে জানা। সেজন্যই আল-কুরআন সর্বপ্রথম 'অদেখার' উপর বিশ্বাস স্থাপন করবার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ্ 'নাই' হতে এ বিশ্ব সংসার—মানুষের দেখা-অদেখা, জানা-অজানা, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষও তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে নূতন অনেক কিছুই সৃষ্টি করছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ যাবৎ মানুষ কি নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে, না পারছে ? পারেনি, পারছে না, এবং পারবেও না। জ্ঞান চর্চা

যতই প্রসারিত হোক না কেন, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যতই সাধিত হোক না কেন, মানুষ নূতন কিছুই সৃষ্টি করতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা অদ্যাবধি কোন মৌল উপাদান সৃষ্টি করতে পারেন নি। যা পারেন, তা হলো, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কোন মৌল উপাদান থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা। মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ক্ষেত্রে আজো এমন কোন উপাদান ব্যবহার করতে পারেনি, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে ছিল না। এতে একদিকে যেমন মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সীমাহীনতাও প্রমাণিত হয়। এবং তিনিই একমাত্র 'নাই' হতে সৃষ্টির ক্ষমতার অধিকারী। "আল্লাহ্ নাই হতে স্বর্গ-মর্ত সৃষ্টি করেছেন।" তিনি 'হও' বলেছেন, আর এ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এ সুন্দর সৃষ্টির পরিণাম কি ? এ কি একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? না, অনন্তকাল এমনি চলতে থাকবে ? যা সৃষ্টি হয়েছে, তা একদিন বিলুপ্ত হবেই! তবে কতকাল পরে তা ধ্বংস বা বিলুপ্ত হবে—এর কোন সময়-সীমা নির্ধারণ মানুষের কল্পনাতীত ব্যাপার।

ঠিক তেমনি মানুষকেও মরতে হয়। আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সুদক্ষ সামরিক বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত রাজ প্রাসাদে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেও কেউই মৃত্যুর অমোঘ আঘাত ঠেকাতে পারে না। শক্তির দাপট, বিজ্ঞানের গরিমা এবং আত্মীয়-পরিজনের মায়া-ভালোবাসার বন্ধন কিছুই তাকে এ বিশ্বে ধরে রাখতে পারে না। তাকে চলে যেতে হয়। যেতে দিতে হয়। যেভাবে একদিন রিক্তহাতে মানুষ এ বিশ্বে আসে, ঠিক সেভাবেই তাকে এ সুন্দর বিশ্বের মায়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর পর যায় কোথায় ?

কবরস্থানের মাটি, শ্মশানের ভস্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানুষের অস্তিত্বের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। মানব জ্ঞান আজ পর্যন্ত যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তা দিয়ে মৃত্যুর সাথে সাথে জলবায়ু, অগ্নি, মাটির দ্বারা মানবদেহ যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি সেই সব উপাদান কিভাবে কোথায় উধাও হয়ে যায় এবং কোথায়ই বা কোন অংশ অবস্থান করে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি এ জড় দেহ যে শক্তির দ্বারা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল—তাই বা কোথায় গেল ? এর জবাব বিজ্ঞানী চিন্তাবিদদের কাছে অজ্ঞেয়।

তদুপরি, যুক্তি-তর্ক তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বা সমগ্র সৃষ্টির বিলুপ্তির পরের কথা ভাবতে গেলে সময় এবং মেধার অপচয়ই হয়, কোন সত্যেই পৌঁছা যায় না। উপরন্তু, চরম হতাশার শিকারে পরিণত হতে হয়। হতাশা মানুষকে আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে। বলাবাহুল্য, এ রকম আত্ম-অবিশ্বাসীর পক্ষে শুধু নিজেরই নয়, বিশ্বেরও কোন মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়।

সৃষ্টির বিলুপ্তির পর পারলৌকিক জগত আছে—একমাত্র এই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস

স্থাপন করেই মানুষ চরমতম হতাশা, আত্মঘাতী আত্ম-অবিশ্বাস ও আত্ম-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

যে জন্মেছে তাকে মরতে হবে। কেউ অমর থাকবে না। এই মহাসৃষ্টির কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

"একমাত্র স্রষ্টার সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। এবং সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

অতএব, এ বিশ্বাস অপরিহার্য যে, ইহলৌকিক জগতের বাসিন্দাকে পারলৌকিক জগত অতিক্রম করতেই হবে। ইহলৌকিক জগতে যারা সৎকর্মশীল, পারলৌকিক জগতে তারা পুরস্কৃত হবেন এবং অসৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা নানাভাবে নিগৃহীত হবে।

পারলৌকিক জগতে দু'টি অবস্থা বা বিভাগ বিদ্যমান থাকবে। একটি জান্নাত বা স্বর্গ, অপরটি জাহান্নাম বা নরক। আল-কুরআনে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে অকল্পনীয় শান্তি-সুখ, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি জাহান্নামে রয়েছে দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার অকল্পনীয় সমাবেশ। দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার সহস্র কোটি অংশের এক অংশও অনুভব করলে যে মানুষের সংজ্ঞা লোপ পাবে।

কুরআনের এসব বর্ণনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলে কোন মানব সন্তানই অসৎ কর্মপরায়ণ হতে পারে না। সমাজ জীবনেও কোন অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন থাকতে পারে না। এই পাপ-তাপে, দুঃখ-জ্বালায় পরিপূর্ণ পৃথিবী প্রেম-সুন্দর, সুখ-শান্তির জান্নাতে পরিণত হতে পারে।

মানুষ তার ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করতে পারে—এ বিশ্বাস অনেকেরই রয়েছে। তাছাড়া, আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ইচ্ছা মাফিক অনেক কিছু করছেও। কিন্তু মানুষ কি তার সকল ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে ? পারে না। তাকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেই জীবন যাপন করতে হয়। সে নিয়ন্ত্রণ চোখে দেখা যায় না বা যুক্তি-তর্ক দিয়ে খুঁজে বের করা যায় না। তবু সে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মানুষের জীবনকে জড়িয়েই। আর এ নিয়ন্ত্রণের ফলেই মানুষের পারলৌকিক জীবন অনিবার্য। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকার ইত্যাদি সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ পরলোকে জান্নাত বা স্বর্গের ব্যবস্থার পাশাপাশি এ জগতে সকল অসৎ কর্মের শাস্তিস্বরূপ জাহান্নাম বা নরকের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ শাস্তির ভয়াবহতার কল্পনাও মানুষের সাধ্যাতীত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে কি এহেন হৃদয়বিদারক শাস্তি প্রদান করবেন ? জান্নাত ও জাহান্নাম যে কোনো স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে—এ রূপক বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে,

জান্নাত ও জাহান্নামের আকার-আয়তন আকাশ-পাতালব্যাপী বিস্তারিত। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান নির্দেশ করা হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান একই স্থানে।

এই দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত 'অবস্থার' অবস্থান একই স্থানে সম্ভব কিনা—তাও বিচার্য। জান্নাত সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

"তোমাদের চক্ষু কখনো তা দেখেনি, জিহ্‌বা সে স্বাদ অনুভব করেনি। শুধু—তোমাদের বুঝাবার জন্য বর্ণনা করা হলো।"

এখন একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, কোথায় জান্নাত জাহান্নামের একত্র অবস্থান সম্ভব ? মানুষের অন্তরেই একমাত্র এ দু'য়ের একত্র সমাবেশ অনুভব করা যায়। সুখোল্লাস যেমন অকল্পনীয়ভাবে মানুষের অন্তরে জান্নাতী অনুভূতি সৃষ্টি করে ; তেমনি দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাও অন্তরকে জাহান্নামের আগুন হতেও অধিক দগ্ধ করে। এ দু'রকম অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। এ কথা বুঝাবার জন্য কোন সম্মুখ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

অনেক সময় নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমেও দু'টি বিপরীতমুখী অবস্থা অবলোকন করা যায়। সৎ-কর্মশীল ব্যক্তি সংসার জীবনে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে সুখ-শান্তি ও তৃপ্তির অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেন। আবার অনেক সময় অসৎ কর্মশীল ব্যক্তি সুখ শয্যায় শুয়েও স্বপ্নে অকল্পনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে থাকে।

নিদ্রা মৃত্যুরই এক প্রাথমিক ইঙ্গিত। আর নিদ্রামগ্ন অবস্থায় মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তাও অনেক সময়ই জান্নাত-জাহান্নামের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া এতে এটাও বোঝা যায় যে, বস্তুবাদী জান্নাত-জাহান্নাম ও বস্তুবাদী দেহ ছাড়াও মানুষের অন্তর সৎ ও অসৎ কর্মফল ভোগ করবেই। অতএব, জান্নাত ও জাহান্নামকে আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গরূপে গ্রহণ করতেই হবে।

ইফাবা—১৯৯৯-২০০০—প্র/৮০০৭(উ)—৫,২৫০